KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩নং হেস্টিংস স্ট্রিট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (Sabuj Patra)	Size : 7.5"x6"
Vol. & Number : 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ আষাঢ় ১৩২৫ শ্রাবণ ১৩২৫ ভাদ্র ১৩২৫ Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

নব-বিদ্যালয়।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীচরণেষু।

(৫)

আজ আমি শরীরচর্চ্চা সম্বন্ধে নব-বিদ্যালয়ের প্রকরণ-পদ্ধতির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব। আগে থাক্‌তেই বলে রাখি—এ পত্রে মূলের চাইতে টীকাভাষ্য ঢের বেশী হবে, কেননা শরীরের কথাটা এদেশে শুধু বিদ্যালয়ের কথা নয়—লোকালয়েরও কথা। ছেলেবেলায় যে ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে আমরা মানুষ হয়েছি, তাঁর ওষুধের প্রতি শিশির গায়ে, একালের অনেক ওষুধের শিশির গায়ে যেমন বড় বড় লাল হরফে poison ছাপানো থাকে, তেমনি বড় আর তেমনি লাল হরফে ছাপানো থাক্‌ত, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"। এ বচন শাস্ত্রীয় কি উদ্ভট তা জানিনে, কিন্তু ঐ ক'টি কথা আমার মনের মধ্যে একেবারে লাল কালিতে ছেপে গিয়েছে,—তার কারণ দশ থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত, এই চার বৎসর ধরে ঐ বাক্যটি আমার চোখের সুমুখে প্রতিনিয়ত ছিল।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"—এ ধর্ম্মজ্ঞান আজ দেশসুদ্ধ লোকের মনে জন্মেছে। তবে উক্ত ধর্ম্মের সাধন-পদ্ধতি যে কি, সে

বিষয়ে আমাদের তেমন স্পষ্ট ধারণা নেই। নিত্যনিয়মিত ওষুধ খাওয়া যে বলাধানের সদুপায় নয়—এ সম্বন্ধে বোধহয় এক ঔষধ-বিক্রেতা ছাড়া আর সকলেই একমত। কিন্তু সদুপায়টা যে কি, তা জানবার জন্য শারীর-বিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করা প্রয়োজন। আমি কিঞ্চিৎ বিশেষণটি ইচ্ছে করেই লাগিয়েছি, কেননা এক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞানের মূল্য বিজ্ঞানের চাইতে নিতান্ত কম নয়।

নব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের মতে, আজকালকার ভাষায় যাকে বলে দেহের অনুশীলন—তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ করা।

সৌন্দর্য্য জিনিষটে যে শক্তির উপর নির্ভর করে, এ বিষয়ে সকল প্রাচীন সভ্যতাই একমত। রূপ—তা সে দেহেরই হোক্ আর মনেরই হোক্, ভাবেরই হোক্ আর ভাষারই হোক্,—আকারের উপরেই যে নির্ভর করে, এবং আকারের সঙ্গতি ও সৌষ্ঠব যে স্বাস্থ্য ও বলের উপরেই নির্ভর করে, এই হচ্ছে ক্লাসিক মত।

দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলাই যে দেহচর্চ্চার মুখ্য উদ্দেশ্য—এ-কথা এ-কালেও বোধহয় বেশীর ভাগ লোক স্বীকার করেন। অতএব সে উদ্দেশ্যসাধনের সদুপায় কি, এই হচ্ছে শিক্ষার প্রথম সমস্যা। কেননা এ পৃথিবীতে দেহই হচ্ছে প্রাণের ভিত্তি।

নব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের মতে, এর সর্ব্বপ্রধান উপায় হচ্ছে ছেলেদের স্নান আহার নিদ্রার একটা সুব্যবস্থা করা। প্রথমে ঘুমের কথাটাই ধরা যাক্।

নব-বিদ্যালয়ে ছেলেদের নয় থেকে এগারো ঘণ্টা পর্য্যন্ত একটানা ঘুমতে দেওয়া হয়। তাঁদের মতে এর কম হলে ছেলেদের স্বাস্থ্য

বজায় থাকে না। দিনে যদি ভাল করে জেগে থাকতে হয়—তাহলে রাত্তিরে যে ভাল করে ঘুমনো দরকার, এ বিষয়ে আমি নিজে সাক্ষী দিতে পারি। রাত জেগে পড়ার ফলে ছেলেরা যে দেহমনে ঝিমিয়ে পড়ে, এই প্রত্যক্ষ সত্যকে অগ্রাহ্য না কর্‌লে—বাঙ্গালী জাতটা আমার বিশ্বাস এর চাইতে ঢের বেশী সজাগ হতে পারত।

তারপর নব-বিদ্যালয়ে ছেলেদের শোবার ঘরের দুয়োর-জানালা কখনও বন্ধ করা হয় না। এ বিষয়ে শীতগ্রীষ্মের কোনও তফাৎ নেই। আমাদের এই গরম দেশে আমরা শুধু দরজা-জানালা নয়—শার্শি পর্য্যন্ত এঁটে শুই; ঠাণ্ডা লাগবার আমাদের এতই ভয়। কিন্তু রুদ্ধ-ঘরের বদ্ধ-বায়ুর ভিতর মানুষ হওয়ায় আমাদের ছেলেমেয়েদের বাল্যে সর্দ্দিকাশি কামাইও যায় না, কমও হয় না; তারপরে যৌবনে হয় তাদের ক্ষয়কাশ। বাংলাদেশের এই রাজধানীতে রাজযক্ষ্মার প্রতাপ—বিশেষতঃ মেয়েমহলে—যে দিনের পর দিন কিরকম বেড়ে চলেছে, তার সন্ধান যে-কোনও ডাক্তারকবিরাজের কাছে পাবেন। অবরোধ-প্রথায় যে মানুষের শ্বাসরোধ করে, তার প্রমাণ আমাদের ঘরে ঘরে পাওয়া যায়। আলোহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে শুধু মানুষ মারবার জন্য,—এরূপ বিশ্বাস করায় ভগবানের উপরেও সুবিচার করা হয় না, নিজের বুদ্ধিরও পরিচয় দেওয়া হয় না। দুয়োর বন্ধ করলেই যে মানুষে তার ভিতর বন্দী হয়—এ জ্ঞান থাক্‌লে, আমরা আমাদের বাসাগারকে কারাগার করে তুলতুম না। বাহিরকে বাহির করে রাখলেই ঘর হয়ে পড়ে কবর। দিবারাত্র খোলা হাওয়ার ভিতর বড় হলে, শরীর যে কত সুস্থ ও কত বলিষ্ঠ হয়, তার পরিচয় ঐ নব-বিদ্যালয়েই পাওয়া গেছে। অধ্যাপক ফারিয়া বলেন যে, তাঁর স্কুলের

ছেলেরা এক বৎসর দ্বার-মুক্ত ঘরে ঘুমতে অভ্যস্ত হবার ফলে, তাদের শীতগ্রীষ্ম সহ্য করবার শক্তি এতটা বেড়ে গেছে যে, তাদের মধ্যে অনেকে, দেশ যখন বরফে জমে যায়, সে সময়ও রাত্তিরে সখ করে মাঠের ভিতর তাঁবু খাটিয়ে তার নীচে শোয়, এবং তাতে তাদের—নিউমোনিয়া ত বড় কথা—শ্লেষ্মাও প্রকুপিত হয় না। এ একটা কম বড় শিক্ষা নয়; কেননা সকলেই জানেন যে, অকাতরে শীতগ্রীষ্ম সহ্য করবার শক্তির নামই তিতীক্ষা। আর যাতে করে তিতীক্ষা আমাদের অঙ্গের ভূষণ হয়, তার জন্য ত সকলেই চীৎকার করছেন।

আর একটি কথা। নব-বিদ্যালয়ের ছেলেদের গ্রীষ্মকালে দিনে ঘুমতে দেওয়া হয়। সে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের "মা দিবাং স্বপ্সি" এ নিষেধ মেনে চল্‌তে হয় না। তার কর্ত্তৃপক্ষদের মতে ছেলেদের পক্ষে শুধু গ্রীষ্মকালে নয়, সকল কালেই, দিনে অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্য চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা নিতান্ত দরকার, নচেৎ বড় হলে তারা পুরোপুরি খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না। অস্থিতত্ত্ব-বিদেরা আবিষ্কার করেছেন যে, বারো চৌদ্দ বয়েসের আগে ছেলেদের পিঠের দাঁড়া মজবুত হয় না, সুতরাং সে বয়েসে দিনভর দেহের বোঝা বইতে হলে তাদের মেরুদণ্ডটা বেঁকে যায়, নুয়ে পড়ে। অধিকাংশ লোকের পৃষ্ঠদণ্ড যে ঋজু নয়, তা সভ্যসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লেই নজরে পড়ে। দেহের এরূপ বঙ্কিম ভঙ্গীটা সুদৃশ্য ত নয়ই, স্বাস্থ্যকরও নয়। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা পৃষ্ঠদণ্ডকে ঋজু করা এতই আবশ্যক মনে কর্‌তেন যে, তার জন্য তাঁদের হঠযোগের সব ভীষণ প্রক্রিয়া অভ্যাস কর্‌তে হ'ত। সময় থাকতে দিনদুপুরে একটু শুয়ে নিলে যদি সেই সুফল লাভ করা যায়, তাহলে তা যে করা কর্ত্তব্য এ বিষয়ে আশা করি দ্বিমত নেই।

(৬)

নিদ্রার পরই ওঠে আহারের কথা। কথায় বলে—"আহারনিদ্রা" যত বাড়াও তত বাড়ে। এ কথার অর্থ—ও দুই কমানো সমান কর্ত্তব্য। নব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা এর প্রথম অংশ গ্রাহ্য করেন, শেষ অংশ করেন না। তাঁদের মতে ছেলেরা যত ঘুমোয় ঘুমক, কিন্তু তাদের ভোজনের একটা সীমা নির্দ্ধারণ করে দেওয়া কর্ত্তব্য। সভ্যসমাজের বেশীর ভাগ লোক যে মরে অতিভোজনের ফলে,—উপবাসে নয়,—এ জ্ঞান যদি সাধারণ লোকের থাক্‌ত, তাহলে পৃথিবীর রোগ শোক অনেকটা কমে আস্‌ত। আমাদের দেশে এ জ্ঞানের বিশেষ দরকার আছে, কেননা আমরা আর যাই হই, জাত হিসেবে মিতাহারী নই। ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের পেটের মধ্যেই পাওয়া যায়। আর্য্য মুসলমান ও ইংরাজের, আর কিছু না হোক, আহার আমরা যুগপরম্পরায় উদরস্থ করেছি। কাঁচকলা সিদ্ধ আদি করে কোপ্তা কাবাব চপ কটলেট সবই আমাদের সমান ভক্ষ্য। পেটে খেলে পিঠে সয়, এ প্রবাদের জন্ম বাঙলাদেশে। অনেকে বলেন যে এতে বাঙালী জাতি তার assimilation-এর শক্তির পরিচয় দেয়; শুধু তাই নয়, যারা স্বদেশী ডাল রুটির সাহায্যে জীবন ধারণ করে, তাদের আমরা ছাতুখোর বলে অবজ্ঞা করি। আমাদের রসনা বিদেশী ভাষা যেরূপ অনায়াসে আত্মসাৎ করে, আমাদের উদর বিদেশী আহারও তদ্রূপ অনায়াসে আত্মসাৎ করে।

নানা প্রকারের চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের রসাস্বাদন করায় সম্ভবত ক্ষতি নেই, কিন্তু তার পরিমাণ একটা সীমার ভিতর আবদ্ধ রাখা স্বাস্থ্যনীতির হিসেবে নিতান্ত প্রয়োজন। Assimilation-এর শক্তি তার প্রবৃত্তির সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যায় না। জীর্ণ করবার শক্তির

চাইতে আমাদের ভোজন করবার প্রবৃত্তি ঢের বেশী হওয়ায়, বাঙালার যুবকদের হয় মন্দাগ্নি, আর প্রৌঢ়দের বহুমূত্র। বহু লোকের দেখ্‌তে পাই একটা ধারণা আছে যে, ও দুই রোগের দ্বারা বাঙালী তার চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়। সে ধারণা নিতান্তই ভুল। উদর ও মস্তিষ্ক এক অঙ্গ নয়, এবং এক প্রকৃতির অঙ্গ নয়। এর একটি নিরেট, আর একটি ফাঁপা; অতএব এ দুয়ের ক্ষুধাও এক নয়, খোরাকও এক নয়। এর অধমটির খোরাক কম জোগালে উত্তমটির শক্তি বাড়ে। আমার বিশ্বাস এই ঔদরিকতাই আমাদের সকল দুর্ব্বলতার মূল কারণ। আমরা জাতকে জাত যে এতটা স্ত্রী-শাসিত—সেও ঐ পেটের দায়ে। শুন্‌তে পাই অপর দেশের স্ত্রীলোকে পুরুষদের হৃদয় তুষ্ট করে তাদের পোষ মানায়—কিন্তু দেখ্‌তে পাই এদেশের স্ত্রীজাতি পুরুষদের উদর পুষ্ট করে তাদের বাগ মানায়। রন্ধনই এ দেশে দাম্পত্যের প্রধান বন্ধন। এই সব কারণে, আমার মতে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের আহার-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করা দরকার; এবং এ শিক্ষা স্কুল থেকে সুরু হওয়াই কর্ত্তব্য। বাল্যকালে অপরিমিত আহার কর্‌লে, যৌবনে দুষ্ট ক্ষুধাকে আর শিষ্ট করা যায় না।

দেশভেদে জাতির খাদ্যাখাদ্যের ভেদ হয়। সুতরাং বেলজিয়ামের স্কুলের আহারের ব্যবস্থা আমাদের স্কুলে নাও চল্‌তে পারে; তবে আমরা যখন সর্ব্বভুক, তখন এই কথাটা আমাদের জানা দরকার যে, নব-বিদ্যালয়ে ছেলেদের মাংসভক্ষণ নিষেধ। এ স্কুলে দুধ ঘি আটা, ফল মূল ও শাক্ সবজিই ছেলেদের প্রধান আহার।

(৭)

নব-বিদ্যালয়ে স্নান প্রাতঃকৃত্য এবং সায়ংকৃত্য। সেখানে ছেলেদের দিনে দুবার নাইতে হয়, সকালে ঘরে ও বিকালে পুকুরে। বারোমাস সকলের পক্ষে ঠাণ্ডা জলেরই ব্যবস্থা। গরম জল ওষুধের মত ডাক্তারের প্রিস্‌ক্রিপ্‌সান ব্যতীত কাউকে ব্যবহার কর্‌তে দেওয়া হয় না। সাঁতার-কাটার সুফলে এঁদের বিশ্বাস এত অগাধ যে, সকল ছেলেকেই সাঁতার শিখ্‌তে হয়, এবং নিত্য অভ্যাস কর্‌তে হয়। এক সহুরে ছাড়া এদেশের আর সকল ছেলেদের অবগাহন-স্নান একটা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, সুতরাং এ বিষয়ে এঁদের কাছে আমাদের কিছু শেখবার নেই—একটা জিনিস ছাড়া; নব-বিদ্যালয়ের ছেলেদের নেয়ে উঠে গা মুছতে দেওয়া হয় না। রোদে হাওয়ায় তাদের গায়ের জল গায়েই শুকোয়। অর্থাৎ তাদের দেহ থেকে এক ভূতকে আর দুই ভূত দিয়ে তাড়ান হয়,—এতে নাকি সে দেহের পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবার সম্ভাবনা অনেকটা কমে আসে। ছেলেরা যাতে করে পুরোদস্তর sun-dried হয়, তার জন্য স্নানান্তে তাদের দিগম্বর অবস্থায় থাক্‌তে হয়, কেননা এ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের বিশ্বাস যে, শরীরের কোন অঙ্গকেই অষ্টপ্রহর অসূর্য্যম্পশ্য করে রাখা সঙ্গত নয়। এ কথাটার বিশেষ করে উল্লেখ করবার কারণ, সমাজ-দেহের অর্দ্ধাঙ্গকে অসূর্য্যম্পশ্য করে রাখায় সে দেহ যে সুস্থ থাকে, এ বিশ্বাস কোন কোনও জাতের আছে। সেই সর্ব্বনেশে ধারণাকে দূর কর্‌তে হলে, আলোহাওয়ার গুণকীর্ত্তন ফাঁক পেলেই করা উচিত। ডোরকৌপীন ধারণ কর্‌লে রক্তমাংসের শরীর যে ইস্পাত হয়ে ওঠে, তার কারণ সে শরীরকে রোদে পুড়িয়ে জলে ডোবানো হয়।

(৮)

স্নান, আহার, নিদ্রা—এ সকলের কাজ হচ্ছে শরীর রক্ষা করা। শরীরকে বলিষ্ঠ ও সক্রিয় করবার জন্য আরও পাঁচরকম উপায় অবলম্বন করতে হয়। সে সকল উপায় মোটামুটি চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(১) খেলা।
(২) দৌড় ঝাঁপ (Sports)।
(৩) ব্যায়াম (Gymnastics)।
(৪) কাজ।

খেলা সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, যে-শিশু যত খেলতে ভালবাসে, সে শিশু তত সুস্থ। সুতরাং তার খেলায় বাধা দেওয়ার অর্থ তার দেহমনের শক্তির স্ফূর্তিতে বাধা দেওয়া। শিশুরা দেহের শক্তি ব্যয় করেই যে তা সুদসুদ্ধ আদায় করে, এ কথা দেহজ্ঞানী মাত্রেই জানেন। কিন্তু খেলে বেড়ালে মনেরও যে উপকার হয়, সে বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহ নন। অথচ ওদিকে একটু মনোযোগ করলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, খেলার ভিতর বুদ্ধি খেলাবার ঢের অবসর আছে। এমন একটা খেলার দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্—যা পৃথিবীর সকল দেশের সকল ছেলেরাই যুগ যুগ ধরে খেলে আসছে। লুকোচুরি খেলা হচ্ছে বিশ্ব-শিশুর নিত্য লীলা। বলা বাহুল্য এ খেলার প্রসাদে অনুসন্ধিৎসা গবেষণা, সমীক্ষা পরীক্ষা, দিক্‌দর্শন পরিদর্শন প্রভৃতি মহামূল্য চিত্তবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন হয়। বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কারের জন্য এ ক'টি ছাড়া আর কোন্ চিৎশক্তির প্রয়োজন হয়?—সত্যকথা বলতে, পৃথিবীর মহা মহা বৈজ্ঞানিক দার্শনিকেরা

সত্যের সঙ্গে লুকোচুরি ছাড়া আর কি খেলছেন? ছেলেবেলায় ছেলেদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে লুকোচুরি খেল্‌লে, আমরা বড় হলে বিশ্বের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে লুকোচুরি খেলতে পারব। যাঁরা দর্শনবিজ্ঞানের ধার ধারেন না, তাঁদের পক্ষেও এ খেলায় অভ্যস্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সামাজিক জীবনে মানুষে লুকোচুরি ছাড়া আর কি খেলে? রাজায় প্রজায়, প্রভু ভৃত্যে, স্ত্রী পুরুষে চিরদিন ত ঐ খেলাই খেলে আসছে;—অতএব দাঁড়াল এই যে, শিশুদের খেলায় বাধা দেওয়া শিক্ষকের পক্ষে অকর্ত্তব্য। তারপর তাদের কোনরূপ খেলা শেখানোও শিক্ষকের কর্ত্তব্য নয়। অধ্যাপক ফারিয়া বলেন, শিশুদের খেলা একটু লক্ষ্য করে দেখলেই দেখা যায় যে, তারা নিত্য নতুন খেলা খেলে। তারা কল্পনা-রাজ্যের অধিবাসী বলে, এ বিষয়ে তাদের উদ্ভাবনী শক্তি অসীম। তাদের কল্পনাকে তারা এবেলা ওবেলা খেলার রাজ্যে বাস্তব ক'রে তোলে। এতেই তাদের আর্টিষ্টিক শক্তির চরিতার্থতা। সুতরাং খেলার ক্ষেত্রে তাদের একেবারে ছেড়ে না দিলে আমরা যে তাদের শরীরকে জখম করি, শুধু তাই নয়,—সেই সঙ্গে তাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে ভোঁতা করি—আর্টিষ্টিক শক্তিকে চেপে দিই। এ সব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে ঃ—

উঠ শিশু মুখ ধোও, পর নিজ বেশ,
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ"

এই শ্লোকটি হতে "পাঠেতে" শব্দটি বহিষ্কৃত করে দিয়ে তার স্থলে "খেলায়" বসিয়ে দেওয়া সঙ্গত। ভোরের বেলায় শিশুরাও যদি সাদা কাগজের উপর কালির আঁচড়ের প্রতি মনোনিবেশ করে, তাহলে কার জন্যই বা "পাখী সব করে রব" আর কিসের জন্যই বা

"কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল"? রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে বলে কি শিক্ষকদেরও শিশুর পাল লয়ে যেতে হবে স্কুলে? Analogy-র বলে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হলে যে উল্টো উৎপত্তি হয়, তার প্রমাণ—স্কুলেও পাঁচন চলে। নব-বিদ্যালয়ে সব রকমের গাছপালা আছে,—শুধু বেত নেই। সে যাই হোক্, ভগবানের সৃষ্টির সকল জিনিসের ভিতর যে একটা যোগাযোগ আছে—সে জ্ঞান আমরা হারালেও, শিশুরা হারায় না; তাই তারা আলো বাতাস পাখী ফুল সকলের সঙ্গে যোগ রেখেই আনন্দ পায়, আর সেই আনন্দই তাদের জীবনীশক্তিকে বিকশিত করে।

(৯)

এ ত গেল খেলার প্রথম অধ্যায়। শিশুর চরিত্র সম্পূর্ণ স্বাধীন, সুতরাং তার খেলাও সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ।

বালকের খেলার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শিশুর খেলা ব্যক্তিগত, বালকের খেলা সামাজিক। শৈশব অতিক্রম করবার পর ছেলেদের মনে যখন সমাজের জ্ঞান জন্মায়—তখন তারা দলবদ্ধ হয়ে খেলে। এ সব খেলার আগাগোড়া ধরাবাঁধা নিয়ম আছে। টেনিস, ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি হচ্ছে সব সামাজিক খেলা—অর্থাৎ দশে মিলে নিয়ম মেনে এ সব খেলা খেলতে হয়। এ সব খেলার প্রধান গুণ যে এতে ছেলেদের চরিত্রগঠনের সহায়তা করে। ব্যায়ামে শুধু শরীর গড়ে, কিন্তু এ শ্রেণীর খেলায় ছেলেদের মনে নীতির বীজ বুনে দেয়। এই শ্রেণীর খেলা হচ্ছে, নব-বিদ্যালয়ের নীতিশিক্ষার একটি

প্রধান অঙ্গ। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা উপদেশ দিয়ে নীতিশিক্ষা দেওয়ায় মোটেই বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন, বহুকালের অভিজ্ঞতার ফলে একথা তাঁরা জোর করে বল্‌তে পারেন যে, নীতির উপদেশ দেওয়াটা যে শুধু ব্যর্থ তাই নয়, ছেলেদের পক্ষে তা বিশেষ ক্ষতিকর। ওতে শুধু একটা নতুন দুর্নীতির শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং তার নাম হচ্ছে "নৈতিক জ্যাঠামি।" এঁদের মতে নৈতিক জীবনের মূলে আছে Collective sense,—অর্থাৎ সেই জ্ঞান, যার ফলে প্রতি লোক নিজেকে সমাজদেহের একটি অঙ্গ বলে মনে করে। এবং যে উপায়ে এই জ্ঞান, এই অনুভূতি বাড়ানো যেতে পারে, সেই উপায়ই হচ্ছে নৈতিক শিক্ষার যথার্থ উপায়;—বক্তৃতা নয়, নীতিপাঠ নয়, মারপিট নয়। এই সব খেলার ভিতর দিয়ে ছেলেরা নিয়মের মাহাত্ম্য বুঝতে শেখে, দশজনের সঙ্গে একাত্ম হতে শেখে, কার্য্য উদ্ধারের জন্য স্বেচ্ছায় স্বার্থপরতা ত্যাগ কর্‌তে শেখে। অতএব ফুটবল প্রভৃতি খেলা সকল ছেলেরই শুধু দেহের নয়, আত্মার উন্নতি লাভের জন্য খেলা কর্ত্তব্য। আইন মুখস্থ করতে নয়, স্বেচ্ছায় মানতে শেখবার সূত্রপাত ঐ খেলার মাঠেই হয়।

(১০)

খেলার পর আসে দৌড়ঝাঁপ—ইংরাজিতে যাকে বলে sports। খেলার সঙ্গে এর প্রভেদ এই যে, শরীরের এক একটি বিশেষ ক্রিয়ার এই উপায়ে অনুশীলন করা হয়। দৌড়নো লাফানো সকল খেলারই অঙ্গ, কিন্তু কি দৌড় কি লাফ কোনও খেলারই একমাত্র অথবা মুখ্য

কর্ম্ম নয়। খেলাতে দেহের সকল শক্তির একত্রে প্রয়োগ দরকার। কিন্তু sports-এর উদ্দেশ্য, দৌড়বার শক্তি লাফাবার শক্তি প্রভৃতিকে আলাদা করে নিয়ে, সেই শক্তিকে বিশেষ করে বাড়িয়ে তোলা। এতে শরীরের যে শুধু এক একটা বিশেষ ক্ষমতা বেড়ে ওঠে তাই নয়, এতে ছেলেদের সাহসও বাড়ে। এর শিক্ষা হচ্ছে দেহের শক্তির সীমা উত্তরোত্তর অতিক্রম করবার শিক্ষা। সুতরাং এ শিক্ষার ভিতর পদে পদে বিপদ আছে। এই বিপদকে উপেক্ষা করতে শেখবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের সাহস আপনাহতেই বেড়ে যায়। সুতরাং sports ছেলেদের শরীর মন দুই একসঙ্গে গড়ে তোলে। নব-বিদ্যালয়ে চৌদ্দ বছরের নীচে ছেলেদের sports শিখতে দেওয়া হয় না। এ কথাটা আমাদের মনে রাখা উচিত, কেননা শিক্ষা বিষয়ে আমাদের আর তর সয় না—সে শিক্ষা শরীরেরই হোক্ আর মনেরই হোক্।

(১১)

সব শেষে আসে ব্যায়াম শিক্ষা। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে স্বতন্ত্রভাবে বলিষ্ঠ করা, এবং সেই সঙ্গে সমগ্র দেহটাকে শক্তিশালী করা। একালের ব্যায়াম হচ্ছে পুরোমাত্রায় বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ তা দেহের বিশেষ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেকালের ব্যায়াম অনেক স্থলে মারাত্মক হত—কেননা কোনও একটা বিশেষ অঙ্গের মাংস বাড়াতে এবং পেশি ফোলাতে গিয়ে, অনেক স্থলে সমস্ত দেহটাকে একেবারে অথর্ব করে ফেলা হত। অবৈজ্ঞানিক

ব্যায়ামচর্চ্চার ফলে, অনেকে লাভের মধ্যে হৃদ্‌রোগ শ্বাসরোগ প্রভৃতি অর্জ্জন করতেন। সমুদয়ের সঙ্গে অবয়বের যোগ যে কতটা ঘনিষ্ঠ, এবং সে যোগসূত্র যে প্রাণ—এই জ্ঞানের অভাববশতঃই পালোয়ানেরা হয় স্বল্পায়ু, আর বাজিকরেরা পঙ্গু। Horizontal Bar-য়ে পাক খেয়ে খেয়ে শরীর যে দড়ি পাকিয়ে যায়, আর Parallel Bar-য়ে পালায় পালায় "কড়িং" ও "ময়ূর"-বৃত্তির সাধনা করে, তীরের মত শরীর যে ধনুকের মত হয়ে যায়, এ আমার চোখে দেখা। বৈজ্ঞানিক ব্যায়ামের চর্চ্চায় অষ্টাবক্র হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। এ ব্যায়ামের প্রকরণপদ্ধতি সব Ling, Muller এবং Hebert-এর বইয়ে দেখতে পাবেন। সংক্ষেপে, যে ব্যায়ামকে Swedish Drill বলা হয়—সে হচ্ছে Ling-এর আবিষ্কৃত পদ্ধতি। Muller এবং Hebert তারই সংশোধিত সংস্করণ বার করেছেন। এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ—সুতরাং এ ক্ষেত্রে বেশী বাক্যব্যয় করা আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় অনধিকারচর্চ্চা। তবে এই ব্যায়াম শিক্ষা দেবার পদ্ধতি সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা আবশ্যক। নব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের মতে, এর শিক্ষক হওয়া উচিত ডাক্তার। প্রথমতঃ, এতে প্রাণায়াম আছে; আর গুরুর অসাক্ষাতে প্রাণায়াম করলে যে মুখে রক্ত ওঠে, তার প্রমাণ আমার জানত অনেক ভদ্রসন্তান যোগ অভ্যাস করতে গিয়ে পেয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, এর ক্রিয়াগুলি নিতান্ত নীরস, কেননা এ খেলা নয়—পুরোদস্তর শিক্ষা। নীরস বলে এ ব্যায়াম বিরক্তিকর হবার সম্ভাবনা, সুতরাং শিক্ষকের পক্ষে এর প্রতি ক্রিয়ার সার্থকতা আগে থাকতে ছেলেদের বুঝিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য। হাত-পা পাগলের মত উল্টোপাল্টাভাবে কেন নাড়ছি, তার অর্থ বুঝলে

সে হাত পা মানুষে মনের খুসিতে নাড়ে। ব্যায়ামটা পুরোপুরি শরীরের শিক্ষা হলেও—ঐ সঙ্গে শরীর-বিজ্ঞানেরও মোটামুটি কথা নব-বিদ্যালয়ের ছেলেরা শেখে। অধ্যাপক ফারিয়ার মতে খেলাধূলো, দৌড়ঝাঁপ, ব্যায়াম, প্রাণায়াম সবই খালি গায়ে করা কর্ত্তব্য। এর সার্থকতা যে কি, তা আমি বল্‌তে পারিনে, ডাক্তারে বল্‌তে পারেন। তবে এ গরম দেশে দেহমুক্ত কর্‌লে আমরা যে মুক্তিলাভ করি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

(১২)

ছেলেদের হাতের কাজ শেখানো যে শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ, এই হচ্ছে একালের শিক্ষা-বৈজ্ঞানিকদের একটা পাকা মত। নব-বিদ্যালয়ে ছেলেদের মূর্ত্তি গড়তে, নক্সা আঁক্‌তে, বই বাঁধতে, বেত বুন্‌তে, কামার কুমোর ও ছুতোরের কাজ কর্‌তে শেখানো হয়। অধ্যাপক ফারিয়া বলেন, এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ছেলেদের কামার কুমোর ছুতোর প্রভৃতি বানানো নয়। তাঁর মতে এ সব শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহকে সক্ষম ও সক্রিয় করা। কর্ম্মের প্রবৃত্তি ছোট ছেলের দেহ ও মনে অতিমাত্রায় থাকে। তারা একটা কিছু না করে, দু'দণ্ড স্থির থাক্‌তে পারে না। এই কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে সুপথে চালানো শিক্ষকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। এ সব কাজে হাত দিয়ে ছেলেরা যে শুধু আনন্দ পায় তাই নয়, সেই সঙ্গে তারা যে হস্তকৌশল লাভ করে, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তার যথেষ্ট প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে। দ্বিতীয়তঃ, এই সব কাজের চর্চ্চায় তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ চর্চ্চা হয়।

এর ফলে তাদের নিরীক্ষণ করবার শক্তি, তুলনা করবার শক্তি, কল্পনা শক্তি, গড়বার শক্তি, রূপজ্ঞান, আকারের জ্ঞান, পরিমাণের জ্ঞান, মাত্রার জ্ঞান, সংখ্যার জ্ঞান, পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে।

অধ্যাপক ফারিয়া বলেন যে, শিশুদের অবশ্য ও সব কাজ শেখানো যায় না, সুতরাং তাদের কাদা দিয়ে আল বাঁধতে, ঘর তৈরি কর্‌তে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। সে ঘর তারা ক্রমান্বয়ে ভাঙ্গবে ও গড়্‌বে—কেননা শিশুমাত্রেই অব্যবস্থিতচিত্ত। এ চিত্তকে ব্যবস্থিত করবার চেষ্টা যেমন ব্যর্থ, তেমনি ক্ষতিকর, কেননা এই সব বিরোধী মনোভাবের সংঘর্ষেই তাদের আত্মার প্রদীপ জ্বলে ওঠে। যাঁরা ছোট-ছেলেদের এই ধূলোমাটির সংস্রব হতে আলগোছ করে, ভদ্রলোক কর্‌তে চান, অধ্যাপক ফারিয়া তাঁদের একটা সত্য স্মরণ রাখ্‌তে বলেন। সে হচ্ছে এই যে, এ পৃথিবীতে মাটি আর জল হচ্ছে ছোট ছেলের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। সুতরাং তাদের জল না ছুঁতে দিলে, ধূলো না নাড়্‌তে দিলে, ও দুয়ে মিলিয়ে কাদা না কর্‌তে দিলে, প্রিয়বস্তুর বিরহে তারা শরীর-মনে শুকিয়ে যায়। এ স্থলে বয়স্ক লোকদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, এ পৃথিবীতে মাটি ও জলের চাইতে মহামূল্য বস্তু আর কি আছে? মানুষের সকল কর্ম্মের মূল উপাদান হচ্ছে ক্ষিতি আর অপ্, সুতরাং শিশুরা এ পৃথিবীতে এসে প্রথমে তারই পরিচয় লাভ কর্‌তে ব্রতী হয়। ঐখান থেকেই তাদের জীবনব্রত-উদ্‌যাপনের সুরু হয়।

(১৩)

নব-বিদ্যালয়ের ছেলেদের কৃষিকর্ম্মও শেখানো হয়। মানুষের আদিম কর্ম্মক্ষেত্র, কৃষকের ক্ষেত্র,—শিল্প-জীবির কারখানা নয়। সুতরাং

ছেলেদের কর্ম্মক্ষমতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করতে হলে, তাদের অল্প-বিস্তর কৃষিকর্ম্ম শেখানোও দরকার। লাঙ্গল চষলে, কোদাল পাড়লে শরীর যে বলিষ্ঠ হয়, সে কথা বলা বাহুল্য; সুতরাং এ অধ্যবসায়ে মন ও চরিত্রের কি উপকার হয়, সংক্ষেপে তারই উল্লেখ করছি।

কারখানায় আমরা জড়-পদার্থ নিয়ে কারবার করি, কিন্তু মাঠে আমাদের সজীব পদার্থের সঙ্গে কারবার করতে হয়। বীজ বোনা থেকে ধান পাকা পর্য্যন্ত আগাগোড়া একটা জীবনের অভিনয় চলে। জীব-তত্ত্বের প্রথম অধ্যায় মানুষে ঐ শস্য-ক্ষেত্রেই পাঠ করতে পারে। এই সূত্রে আমরা যে জীবনের ক্রমবিকাশের জ্ঞানলাভ করি, শুধু তাই নয়,—সেই সঙ্গে সে জীবন যে আমরা রক্ষা করতে পারি, সংশোধিত করতে পারি, পরিবর্দ্ধিত করতে পারি, সে জ্ঞানও লাভ করি; এক কথায় এই সূত্রে আমরা আত্মজ্ঞানও লাভ করি।

তার পর মাঠে কাজ করবার দরুণ, ছেলেরা নানা গাছপালা ফুল ফল কীট পতঙ্গ জীবজন্তুর সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করে। শুধু তাদের আকৃতি নয়, তাদের প্রকৃতিরও পরিচয় পায়। এই উপায়ে তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার দিনের পর দিন পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই জ্ঞানের ভিত্তির উপরেই তাদের কেতাবি বিজ্ঞানের শিক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গাছপালা জীবজন্তুর সঙ্গে যে ছেলের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে—বটানি, জুওলজির কথা তার কাছে আর শুধু বইয়ের কথা নয়—জীবনের কথা।

কৃষি-কর্ম্মের আর একটি মহৎ ফল এই যে, ছেলেরা হাতেকলমে ও-কাজ করলে বড় বয়েসে কৃষি-জীবিদের প্রতি আর অবজ্ঞা করে না। অলস ভদ্রসন্তানেরা নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের যে অবজ্ঞার চোখে দেখে, তার প্রধান কারণ যে, কৃষিকার্য্যের ভিতর যে কি মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব

আছে, সে বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যে ছেলে ও-কাজ নিজে হাতে করতে চেষ্টা করেছে, সে ছেলে চিরজীবন কৃষি-জীবিদের মনে মনে শ্রদ্ধা করবে। সামাজিক হিসেবে এও একটা কম লাভ নয়। আজ এই পর্য্যন্ত। বারান্তরে শরীর ছেড়ে মনের শিক্ষার নবপদ্ধতির বিষয় আলোচনা করা যাবে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

দু-দু-বার।

—:০:—

ছেলেবেলায় খিড়কী পুকুরের ঘাটের পাশে পাঁশগাদায় যে সব কচুগাছ জন্মাত তারি কচিপাতা ছিঁড়ে পুকুরের জলে চুবিয়ে নিয়ে যখন দেখতুম তার উপরে জলের দাগ একটুও ধরেনি তখন ভারী আনন্দ হোতো; কিন্তু বিবাহিত-জীবনের পানাপুকুরের মধ্যে মনটাকে দু-দুবার চুবিয়ে ধরেও আজ এই ৬০ বৎসর বয়সে তাকে ডেঙ্গায় তুলে নিয়ে যখন দেখি তার উপরে উক্ত জীবনের একটুও দাগ লেগে নেই, তখন ঠিক ছেলেবেলাকার মত আনন্দ হয় কিনা বলতে পারি না।

আমার বয়স আজ ৬০ কি তার চেয়েও দু এক বছর বেশী হবে কিন্তু এখনও আমি নিজেকে যুবা বলে মনে করি। এই কথা আমি আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে বলেছিলুম, তিনি ত হেসেই খুন, তারপর হাসির বেগটা একটু থামলে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এ কেমন করে হতে পারে?" এই কি করে হতে পারার জবাব দেওয়াটাই শক্ত। আজও পাঠককে যে এর জবাব দিতে পারবো বলে ত মনে হয় না তবে গল্পটা শেষ অবধি পড়ে তাঁরা যদি আপনা হতে এর জবাব পেয়ে যান ত ভালই—নচেৎ নাচার।

আমার প্রথমবার বিবাহ হয় গ্রামের মাইনর স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক হরকালিবাবুর প্রথমা কন্যা নীরদাসুন্দরীর সঙ্গে। ছেলে-বেলা থেকেই বিবাহ না করাটার উপর আমার কেমন একটা ঝোঁক

ছিল আর এই ঝোঁকটার জন্যে যদি কাউকে দায়ী করতে পারা যায় ত সে আমাদের গ্রাম্য-ইংরেজী স্কুলের নব্য-হেডমাষ্টার মশাই রমেশ বাবুকে। তিনি উক্ত জিনিসটার উপর কেন যে এত খড়্গহস্ত ছিলেন তা তিনিই জানতেন, তবে এর অপকারিতা সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা বলতেন তা থেকে এইটুকু বোঝা যেতো যে তাঁর মতে ও-জিনিসটা মানুষের স্বাধীনতার মূলে খুব জবর গোচের একটা ঘা দেয় আর সেই ঘা মানুষের পা দুটোকে একবারে জন্মের মত খোঁড়া করে দেয়—তার চলবার শক্তি একবারে বন্ধ হয়ে যায়।

কথাটা আর কারুর মনের উপর ছাপ কাটতে পেরিছিল কিনা জানি না তবে আমার মনের উপর যে একবারে কোঁদাই কেটে দিয়েছিল সে কথা জোর করেই বলতে পারি। যখন নিজের স্বাধীনতাকে বাঁচাবার জন্যে তার চারিদিকে নানারূপ সংকল্পের পরিখা ও প্রাকার তৈরি করছি সেই সময় দিগ্বিজয়ী বীরের মত মা তাঁর সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র সঙ্গে নিয়ে একবারে সিংহদ্বারের সুমুখে এসে হাজির।

এই কথা নিয়ে মার সঙ্গে প্রায়ই আমার গোল বাধতো কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন পক্ষই ডিক্রী পায় নি। সেদিনও মার সঙ্গে আমার ঐ একই কথা নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলছিল মাঝখানে হঠাৎ আমি বলে উঠলুম, "দেখ মা, আমি যখন বলেছি বিয়ে করব না তখন কখনই করব না তা তুমি কাঁদ কাট আর যাই করনা কেন।"

এই ব্যাপারের কিছুদিন পর একদিন বৈকালে বাইরে বেরুবার জন্যে কাপড় ছাড়ছি এমন সময় বাবা এসে হাজির—"দেখ নিরু আজ আর বাইরে বেরিয়ে কাজ নেই হরকালি বাবুরা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন।"

বাবা ছিলেন সেই দলের লোক যারা যুক্তির চাইতে জিদ্‌কেই বড় আসন দেয়। জিদ্ জিনিষটা তবেই নাকি দাঁড়াতে পারে যদি তার বিপক্ষতাচরণ করবার মত জিনিস সে পায়—নইলে তার অস্তিত্বই যে থাকে না। কিন্তু এটা ত আর কেউ আশা করতে পারে না যে পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিসটাই তাঁদের মতের সঙ্গে আস্তিন গুটিয়ে ঘুসোঘুসি করবে, কাজেই জিদ্‌কে তার কাজ করবার অবসর দোবার জন্যে এই সব লোককে অনেক সময় করতে হয় কিনা, যেখানে নিজের মতের সঙ্গে পরের মতের মিল রয়েছে সেখানে পরের মতকে না উল্টোতে পেরে নিজের মতকেই ধাঁ করে উল্টে নিয়ে জিদ্‌কে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

আমার বিবাহের জন্যে বাবার কোন দিন একটুও গা দেখিনি বরং বরাবর এলাকাড়াই লক্ষ্য করে এসেছি, আজ হঠাৎ আমার বিয়ের জন্যে তাঁর মাথাব্যথা দেখে আমি প্রথমটা কিছু অবাক হয়ে গেছলুম কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলুম মারই জয় হোলো; আমার অত সতর্কতা সত্বেও দুর্গের কোন্ এক গুপ্তদ্বার আবিষ্কার করে ফেলে বিজয়ী বীর যেদিন সত্য সত্যই আমার দুর্গের মধ্যে প্রবেশ লাভ করলে, সেদিন তার হাতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমি দ্বিতীয় উপায় দেখলুম না।

আমরা যেটাকে চাই না সেটার সম্বন্ধে বেশী চিন্তাও করি না আর আমরা যেটাকে নিয়ে বেশী চিন্তা করি না—সেটার আবির্ভাব যত নূতনত্ব, যত মোহ এনে দেয়; আমরা আগে থেকেই যেটাকে মনে মনে এঁচে রেখে দিই তার আবির্ভাব ততটা মোহ বা ততটা নূতনত্ব এনে দিতে পারে না। আমি বিবাহ করব

না বলেই হোক বা যে কারণেই হোক স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে মনে মনে কোনদিন বিশেষ কোন ধারণা আনবার চেষ্টা করিনি, যা নাকি শতকরা নিরেনব্বই জন করে থাকে যৌবনে প্রথম পদার্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গে। তাই একটি ১১ বৎসরের সুগোল, সুন্দর ছোট মেয়ে তার পা-ভরা আলতা আর সিঁতে-ভরা সিঁদুর নিয়ে আমার একলা শোয়া খাটের একটি ধারে সমস্ত দেহটা কাপড়ে আর লজ্জায় ঢেকে নিয়ে যেদিন প্রথম শয়ন করতে এল, সেদিন সমস্ত দেহটা কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল একটা অভূতপূর্ব্ব অব্যক্ত পুলকভরে।

আমার বিবাহের মধ্যে একটুখানি নূতনত্ব ছিল সেটা হচ্ছে এই যে, বাবা কন্যাপক্ষের কাছ থেকে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নি। লোকে এ সম্বন্ধে কিছু বল্লেই তিনি বলতেন "দরিদ্র ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ টাকার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।" পাড়ার লোকে কিন্তু বাবার উপর অত্যন্ত চটে উঠেছিল—তাঁদের মতে এ কাজটা অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল কেননা এতে করে পাত্রের বাজার নেবে যাবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট।

সবের মধ্যে থেকেই মানুষ নিজের জন্যে খানিকটা সান্ত্বনা খুঁজে নেয়—তা না হলে সে বাঁচতে পারে না। যেখানে সত্যি সান্ত্বনা নেই সেখানেও তারা কোন না কোন উপায়ে একটা সান্ত্বনার খুঁটি খাড়া করে তোলে, তাকে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যে, তা না হলে সে যে মুখ থুবড়ে পড়বে। আমিও তাই করলুম। এই এত বড় একটা সঙ্কল্পের বাঁধ যেদিন বাবারূপ ভাগ্য-দেবতার একটি তর্জ্জনী হেলনে নদীর বালুচরের মত ধস্ ভেঙ্গে পড়ল, সেদিন নৈরাশ্যের সেই দুকূলহারা অনন্ত জলরাশির মধ্যে সান্ত্বনার একটা তক্তা যদি খুঁজে

পাই তারি জন্যে হাতড়ে বেড়াতে লাগলুম; পেতে বেশী দেরী হোলো না; বিনাপণে বিবাহ, দরিদ্র ব্রাহ্মণের দায়োদ্ধার—এই ত ভেসে যাবার মত তক্তা রয়েছে! আমি ডুবলুম না।

দরিদ্রের দায়োদ্ধার, এটা কম সান্ত্বনা নয়! এই চিন্তাটাকে জপমালা করে চোক কান বুজে বিয়ে করে ফেললুম। এতে ফল হোলো এই যে, স্ত্রী সম্বন্ধে মনে মনে কোন ছবি আঁকতে গেলেই আমি সেই সব রং আর সেই সব রেখাগুলোই কেবল তার মুখে বিশেষ করে ফলিয়ে তুলতুম, যেগুলো তার মনের কৃতজ্ঞতাকেই কেবল মুখে ফুটিয়ে তুলতে পারে—আর কোন ভাবকে নয়। সে যে চিরকাল আমার কাছে কেনা হয়ে থাকবে, আর তার বাপের প্রতি আমাদের দয়ার কথা ভেবে আমাকে দেবতার মত করে পূজা করবে খুব শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে, স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে গেলেই এই কথাটাই প্রথমে মনের মধ্যে বেজে উঠতো। এমনি ধারণা নিয়ে নীরদাকে ঘরে এনে তুললুম, আর অতি সাবধানে এবং সতর্কতার সঙ্গে তার সঙ্গে এমন ভাবে মিশতে লাগলুম, যাতে তার এই ধ্যান-মাধুরী কোন দিন না ভেঙ্গে যেতে পারে। আমার প্রত্যেক ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা ভাব থাকতো যা নাকি কেবল তার মনের মধ্যে কৃতজ্ঞতার যে অংশটা আছে তাকেই নাড়া দিতে পারে—আর কিছুকেই নয়।

নীরদা মেয়েটি যে কেমন তা ঠিক করে বলা শক্ত, তবে এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় তার মধ্যে নিজস্ব বলে কিছু ছিল না বা তাকে নিজস্ব কিছু সঞ্চয় করতে দেওয়া হয় নি, তার বাপের বাড়ীর তরফ থেকে। বাপের বাড়ীর পক্ষে এটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল সন্দেহ নেই। মেয়েদের যদি কোন একটা দিক থেকে

গোড়ে তোলা হয় তাহলে ত আর ভাঙ্গবার জো থাকে না, অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্বশুরবাড়ী গিয়ে তাদের নিজেকে ভেঙ্গে একবারে চুরমার করে ফেলবার দরকার হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে তাদের যদি কেবল তাগাড় আর ইট্ সুরকীর মত বেতৈরী অবস্থাতে ফেলে রাখা হয় তাহলে সে-গুলোকে এক করে নিয়ে তাদের দিয়ে নূতন ইমারত বেশ সহজে তৈরী করে তুলতে পারা যায়, শ্বশুরবাড়ীর ইঞ্জিনিয়ারের নির্দ্দেশ মত। মোট কথা আমি তাকে গড়ে তোলবার মত বেতৈরী অবস্থাতেই পেয়েছিলাম আর তৈরী করতেও কসুর করি নি।

আমার দেবতা হবার সাধ, সে খুব মিটিয়েছিল তার কৃতজ্ঞতার অঞ্জলী ক্রমাগতক তার উপকারকের চরণে উৎসর্গ করে।

পুতুল নাচের পুতুলগুলো যেমন তাদের হাত পা ততক্ষণই নাড়তে পারে যতক্ষণ পিছন থেকে একজন সে গুলোকে নড়িয়ে দেয়, নীরদার জীবনটা হয়েছিল অনেকটা সেই রকম। তার নিজের ইচ্ছা বলে কোন বালাই ছিল না—আমার সম্বন্ধেও নয়।

আমার বোধ হয়, যৌবন তার নিজের গুরুভারে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন সে খোঁজে এমন একজনকে যার উপর নিজের দায়িত্বের বোঝা খানিকটা চাপিয়ে দিয়ে সে নিজে কতক হাল্কা হতে পারে—তা না হলে সে নিজের চাপে নিজেই মাটির সঙ্গে বসে যাবে যে।

দেবতা হবার সাধ যেদিন মিটলো তার নূতনত্বের চটক্ যে-দিন গিল্টিকরা মরা সোণার মত দিন দিন ম্লান হয়ে আস্‌তে লাগলো সে-দিন বুঝলুম সব উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে।

বিবাহের কয়েক বৎসর পরে আমার পাণ-দোষটা ধরেছিল। আমার বোধ হয় মানুষের প্রবৃত্তিগুলো এমন ভাবে সাজান থাকে যে

একটা অন্যগুলোর পথ আট্‌কে রেখে দেয়, কাজেই একটা যদি হোঁছট খেয়ে পড়ে ত অন্য যে-গুলো তাকে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেগুলোও টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যায়। যেদিন প্রথম সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেল সেদিন থেকে এইটেই আমি রবাবর লক্ষ্য করে আসছি যে একে একে অনেকগুলো সংযমই তার সঙ্গে আলগা হয়ে আসছে।

আমি যে মদ খেতে সুরু করেছি এ কথাটা বাবা এবং মা'র কাছে যথাসম্ভব লুকোবার চেষ্টা করতুম কিন্তু নীরদার কাছে কোন দিন সাবধান হই নি বা সাবধান হবার কোন দরকার বোধ করি নি। এতে যে তার কিছু মনে করবার আছে একথা কোন দিন মনেই আসে নি। হাজার হোক্ আমি স্বামী আর সে স্ত্রী।

লোকে কথায় বলে অন্যায় কখন চাপা থাকে না—আমার অন্যায়ও বেশী দিন চাপা রইল না—পাড়াময় কানাঘুসো হয়ে গেল!

সে-দিন সন্ধ্যার সময় কি একটা কাজে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলুম, বারান্দা থেকে শুন্‌তে পেলুম ঘরের ভিতর ওবাড়ীর টেপী নীরদাকে বল্‌ছে—

"তা তুই যদি এতদিন টের পেয়েছিস ত বারণ করিস নি কেন? ধন্যি মেয়ে যা হোক তুই।"

"তা নাকি আবার বারণ করা যায়।"

"কেন যায় না, আমরা হলে ত বকে ঝোকে অস্নাথ্য করতুম আর তুই বারণ করতে পারবি নি।"

"না তা পারবো না।"

"সে কি রে, তা না হলে দিন দিন যে বেড়ে উঠবে।"

"তা কি করবো? আমার কোন কথা বলা কি উচিত? আমি মেয়ে মানুষ ভালমন্দ কি বুঝি বল।"

"মদ খাওয়াটা ভাল কি মন্দ তা তুই বুঝিস নে; এ নূতন কথা বটে।"

কি জানি কেন নীরদার কথাগুলো সে-দিন তত ভাল লাগলো না। যেটাকে এতদিন খাঁটী ভক্তির সুর বলে মনে হোতো, আজ কি জানি কেন তার মধ্যে নিরপেক্ষতার সুর মিশ্র হয়ে রয়েছে বলে কানে বাজতে লাগলো।

এই ঘটনার কিছু দিন পর এক দিন কোন দরকারে সুরেশবাবুদের বাড়ীতে তাঁকে ডাকতে গেছি—ইনি আমাদের ওখানের একজন পুরাণো উকিল। ইনিই আমাকে সুরাদেবীর মন্দিরের স্বর্ণদ্বার দেখিয়ে দিয়ে ছিলেন। সুরেশবাবুদের বাড়ীতে প্রবেশ করেই উঠান থেকে শুনতে পেলুম সুরেশবাবুর স্ত্রী তীব্র-স্বরে বলছেন—"দেখ অমন করে যদি ঢলাঢলি কর ত আমি সংসার করতে পারবো না; ভেবে দেখ দেখি কি ছিলে আর কি হয়েছ; লোকে তোমাকে কত ভাল বলত, কত সুখ্যাতি করত আর এখন কি হয়েছ। তারপর মেয়েটা দিন দিন কলা গাছের মত বেড়ে উঠছে সেটা কি চোখ মেলে একবার দেখেছ। সংসারের খরচ দিন দিন কত বেড়ে উঠছে সে খবরটা কি রাখ? অমন করে লবাবি করলে শেষকালে ছেলেগুলোর হাত ধরে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে যে।"

এক একটা লোক থাকে তাদের গলা বেশ মিঠে কিন্তু আগাগোড়া বে-সুরা। এই সব লোকের গান ততক্ষণই ভাল লাগে যতক্ষণ না কোন যন্ত্রের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নেওয়া হয়। নীরদার ব্যবহারের

মধ্যে মিষ্টতা ছিল বটে কিন্তু তার মধ্যে সুর ছিল না আদবেই, তাই আজ যখন সুরেশবাবুর স্ত্রীর এই সুরে-বসান যন্ত্রের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নিলুম তখন তা খাপছাড়া বলে মনে হতে লাগলো। কথাগুলো তীব্র বটে কিন্তু কেমন সুর রয়েছে, কেমন রেশওয়ালা আর নীরদার সেদিনকার কথাগুলো নরম বটে কিন্তু কত বেসুরা কত ফাঁকা। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা অভাবের বেদনা বেজে উঠলো। এইটেকেই যে আমি খুঁজে আসছি। এইটেকেই যৌবন যে তার সুদৃঢ় বাহু দুটোকে বাড়িয়ে হাতড়ে হাতড়ে বেড়িয়েছে এতদিন ধরে, আর এইটেকে পায় নি বলেই যে তার যত অবসাদ যত বৈরাগ্য।

বাড়ী ফিরলুম—রাত্রে নীরদা এসে যখন তার নির্দ্দিষ্ট জায়গাটি দখল করে শুলো তখন মধ্যের ব্যাবধানটা চোখের সুমুখে সহসা যেন যোজন-ব্যাপী হয়ে দাঁড়ালো। এ যে অনেক দূরের জিনিস, এ যে দু'কুল হারা নদীর পরপারের ঝাপসা গাছপালা; ঘাটে তরীও ত নেই যে সেগুলোকে নিকটের জিনিস করে নিই।—আবেগ ভরে ডাকলুম—"নীরদা"।

সেই দূর থেকে—অনেক দূর থেকে এলোমেলো বাতাসে ভাসা আবছা উত্তর "কেন"?

"কেন নয় নীরদা আরো বড় করে উত্তর দাও।"

নীরদা নীরব।

"আমি মদ খেয়েছি, তুমি বকবে না নীরদা!"

"কেন বোকবো?"

"কেন বোকবে?" তোমার স্বামী উচ্ছন্নয় যাবে আর তুমি তাকে

বোকবে না, তাকে বারণ করবে না, তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবে না? কথা কও না যে!"

"আমি কি বলবো?"

আমার কান্না পেতে লাগলো কোন কথা বল্‌লুম না—বুঝলুম আর ফেরাবার উপায় নেই। নিজেই আমি তাকে দূর করে দিয়েছি নিজেই আমি তার এবং আমার মাঝখানে এমন একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গেঁথে তুলেছি যা ডিঙ্গিয়ে আসার মত ক্ষমতা তার আদবেই নেই।

এমনি করে এই দূরের জিনিষটিকে কাছে আনবার ব্যর্থ চেষ্টার বিড়ম্বনার ফাঁক দিয়ে আরও দশ বার বৎসর গলে চলে গেল। তারপর কি জানি কার ইসারায় এই দূরের জিনিসটি সহসা একদিন এত দূরে চলে গেল যে তার চিহ্ন পর্য্যন্ত আর খুজে পাওয়া গেল না।

নীরদা চলে যেতে সমস্ত শরীরটায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখলুম কোন খানটায় সে তার অভাব রেখে গেছে। বুকে হাত দিলুম; না সেখানে ত কোন নূতন অভাব নেই; মাথায় হাত দিলুম—সেখানেও তাই, কিন্তু পায়ে হাত দিতে সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল; এই খানেই যে সে তার সমস্ত অভাব রেখে গেছে। পা-টেপবার লোকের অভাবই ত সে তার চলে যাবার পথের মধ্যে রেখে গেছে। বুকে হাত বুলোবার অভাব পূরণ করবার জন্যে সে আসে নি, তাই সেখানটার আভাব আগেও যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনিই রয়ে গেছে একটুও এদিক ওদিক হয়নি।

আমার জীবনে এই প্রথম যৌবনারম্ভ। এই প্রথম যৌবন তার রত্নসিংহাসন বুকের মাঝখানে হিড় হিড় করে টানতে টানতে এনে বসিয়ে দিয়ে গেল, আর সঙ্গে কোথা হতে ধূপ ধূনা জ্বলে উঠলো এক জনকে বরণ করে নেবার জন্যে সেই মসনদের কিংখাপের উপর।

বলতে ভুলে গেছি—ইতিমধ্যে বাবা স্বর্গারোহণ করেছেন।

মা আবার নূতন করে কনের সন্ধান আরম্ভ করে দিলেন তাঁর ৫০ বৎসরের তরুণ ছেলেটির জন্য, আর তাঁর ৫০ বৎসরের তরুণ ছেলেটি চুপ করে থেকে তার সম্মতি জানিয়ে দিলে তরুণ ছেলেটিরই মত করে।

ফুলশয্যার রাত্রেই ষোড়শী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি আমাকে ভালবাস।" কথাটা বড়ই অসংলগ্ন হয়েছিল সন্দেহ নেই—কিন্তু আমি নাচার। কমলা উত্তর দিয়েছিল, "হ্যাঁ"!

দিন কাটতে লাগলো; এবার মনে মনে স্থির করেছিলুম পা-টাকে যথাসম্ভব গুটিয়ে রাখবো, যাতে এবার আর সে পা দেখতে না পায় কিন্তু এটা তখন বুদ্ধিতে আসে নি যে, পা বাদ দিলেও বুক ছাড়া অন্য আরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে যার উপর মানুষ খুব স্বচ্ছন্দে চড়ে বসতে পারে। কমলা পা দেখতে পায় নি সন্দেহ নেই কিন্তু সে বুকও দেখতে পায় নি, সে দেখে ফেলেছিল কেবল পাকাচুলে ভরা গোল মাথাটা আর সেইখানেই সে তার চিরদিনের আসন খানি টেনে নিয়ে গিয়ে খুব নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়ে দিয়েছিল। এক কথায় দোজ-পক্ষের পরিবার যেমন হয়ে থাকে কমলা তার চেয়ে একটু কমও হয় নি একটু বেশীও হয় নি।

নেশা করার দরুণ পায়ের তরফ থেকে নীরদা কোন কথা বলতে সাহসই করে নি আর মাথার তরফ থেকে কমলা যা বলেছিল তার বিষ তার নিজের রাজত্ব থেকে আরম্ভ করে নীরদার রাজত্ব পর্য্যন্ত চারিয়ে গেছ্‌লো। কিছু-না-বলার ভিতর দিয়ে নীরদা নিজেকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—আর কমলা যা বলেছিল তার তীব্রতা আমাকেই দূর করে দিয়েছিল তার কাছ থেকে, বড়লোকের দরোয়ানের মত করে।

এমনি করে এই চড়া মনিবের হাতে আমাকে ১০টি বৎসর পুরাদমে থাকতে হয়েছিল নীরবে সমস্ত সহ্য করে। তারপর সেও একদিন চলে গেল অভাব রেখে দিয়ে মাথার উপরটাতে। সেখানটা সত্য সত্যই তার অভাবে বড় খালি খালি ঠেকতে লাগলো। অনেক দিন কয়েদের মধ্যে থেকে হঠাৎ স্বাধীনতা পেয়ে কয়েদীর যে অবস্থা হয় এও অনেকটা সেই রকম।

আজও যৌবনের রত্নসিংহাসন তেমনি করেই খালি হয়ে পড়ে রয়েছে দেবীর অভাবে। ধূপ ধুনা দিনের পর দিন কেবল ছাই হয়েই মরছে সিংহাসনের চারিদিকে তার কুণ্ডলিকৃত সুগন্ধী ধূমরাশি ছড়িয়ে ছড়িয়ে। ঘণ্টা বাজছে, আরতী-প্রদীপ জ্বলে জ্বলে নিভে যাচ্ছে। পুষ্প-সম্ভার পুষ্পপাত্রে উন্মুখ হয়ে রয়েছে কার চরণ স্পর্শের মানসে।

পায়ের সেবা আমার হয়ে গেছে—মাথার সেবাও মন্দ হয় নি কিন্তু বুকের সেবা আজও বাকী রয়েছে। হুকুম করবার সাধ আমার মিটেছে; হুকুম তামিল করবার সখও পূর্ণ হয়েছে; কিন্তু আব্দার শোনবার সাধ আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

কালো-মেয়ে।

—:০:—

মরচে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জান্‌লাখানি ;
পাশের বাড়ির কালো-মেয়ে নন্দরাণী
ঐখানেতে বসে থাকে একা,
শুক্‌নো নদীর ঘাটে যেন বিনা কাজে নৌকোখানি ঠেকা।

বছর বছর করে' ক্রমে
বয়স উঠ্‌চে জমে'।
বর জোটে না, চিন্তিত তার বাপ ;
সমস্ত পরিবারের নিত্য মনস্তাপ
দীর্ঘশ্বাসের ঘূর্ণিহাওয়ায় আছে যেন ঘিরে
দিবস রাত্রি কালো মেয়েটিরে।

সাম্‌নে বাড়ির নীচের তলায় আমি থাকি "মেস্"-এ ;
বহুকষ্টে শেষে
কালেজেতে পার হয়েচি একটা পরীক্ষায়।
আর কি চলা যায়
এমন করে' এগ্‌জামিনের লগি ঠেলে ঠেলে ?
দুই বেলাতেই পড়িয়ে ছেলে
একটা বেলা খেয়েচি আধ্‌-পেটা।

ভিক্ষা করা সেটা
সইত না এক্‌-বারে,
তবু গেছি প্রিন্সিপালের দ্বারে
বিনি মাইনেয়, নেহাৎ পক্ষে, আধা মাইনেয়, ভর্ত্তি হবার জন্যে।
এক সময়ে মনে ছিল আধেক রাজ্য এবং রাজার কন্যে
পাবার আমার ছিল দাবী,
মনে ছিল ধন মানের রুদ্ধ ঘরের সোণার চাবি
জন্মকালে বিধি যেন দিয়েছিলেন রেখে
আমার গোপন শক্তিমাঝে ঢেকে।
আজ্‌কে দেখি নব্যবঙ্গে
শক্তিটা মোর ঢাকাই রইল, চাবিটা তার সঙ্গে।

মনে হচ্চে ময়না পাখীর খাঁচায়
অদৃষ্ট তার দারুণ রঙ্গে ময়ূরটাকে নাচায় ;
পদে পদে পুচ্ছে বাধে লোহার শলা,
কোন্ কৃপণের রচনা এই নাট্যকলা ?
কোথায় মুক্ত অরণ্যানি, কোথায় মত্ত বাদল মেঘের ভেরী ?
এ কি বাঁধন রাখ্‌ল আমায় ঘেরি ?

ঘুরে ঘুরে উমেদারির ব্যর্থ আশে
শুকিয়ে মরি রোদ্দুরে আর উপবাসে।
প্রাণটা হাঁপায়, মাথা ঘোরে,
তক্তপোসে শুয়ে পড়ি ধপাস্ করে'।

হাত-পাখাটার বাতাস খেতে খেতে
হঠাৎ আমার চোখ পড়ে যায় উপরেতে,—
মর্‌চে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জান্‌লাখানি,
বসে আছে পাশের বাড়ির কালো-মেয়ে নন্দরাণী।
মনে হয় যে রোদের পরে বৃষ্টিভরা থম্‌কে-যাওয়া মেঘে
ক্লান্ত পরাণ জুড়িয়ে গেল কালো পরশ লেগে।

আমি যে ওর হৃদয়খানি চোখের পরে স্পষ্ট দেখি আঁকা ;—
ও যেন জুঁই ফুলের বাগান সন্ধ্যাছায়ায় ঢাকা ;
একটুখানি চাঁদের রেখা কৃষ্ণপক্ষে স্তব্ধ নিশীথ রাতে
কালো জলের গহন কিনারাতে।
লাজুক ভীরু ঝরণখানি ঝিরি ঝিরি
কালো পাথর বেয়ে বেয়ে লুকিয়ে ঝরে ধীরি ধীরি।
রাত-জাগা এক পাখী,
মৃদু করুণ কাকুতি তার তারার মাঝে মিলায় থাকি থাকি।
ও যেন কোন্ ভোরের স্বপন কান্নাভরা,
ঘন ঘুমের নীলাঞ্চলের বাঁধন দিয়ে ধরা।
রাখাল ছেলের সঙ্গে বসে বটের ছায়ে
ছেলেবেলায় বাঁশের বাঁশি বাজিয়েছিলেম গাঁয়ে।
সেই বাঁশিটির টান
ছুটির দিনে হঠাৎ কেমন আকুল কর্‌ল প্রাণ।
আমি ছাড়া সকল ছেলেই গেছে যে যার দেশে,
একলা থাকি "মেস্"-এ।

সকাল সাঁঝে মাঝে মাঝে বাজাই ঘরের কোণে
মেঠো গানের সুর যা' ছিল মনে।

ঐ যে ওদের কালো-মেয়ে নন্দরাণী
যেমনতর ওর ঐ ভাঙা জান্‌লাখানি,
যেথানে ওর কালো চোখের তারা
কালো আকাশতলে দিশাহারা ;
যেথানে ওর এলোচুলের স্তরে স্তরে
বাতাস এসে করত খেলা আলসভরে ;
যেখানে ওর গভীর মনের নীরব কথাখানি
আপন দোসর খুঁজে পেত আলোর নীরব বাণী ;
তেম্‌নি আমার বাঁশের বাঁশি আপনা-ভোলা,
চারদিকে মোর চাপা দেয়াল, ঐ বাঁশিটি আমার জান্‌লা খোলা।
ঐখানেতেই গুটিকয়েক তান
ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার ঘুচিয়ে দিত অসীম ব্যবধান।
এ সংসারে অচেনাদের ছায়ার মতন আনাগোনা,
কেবল বাঁশির সুরের দেশে দুই অজানার রইল জানাশোনা।
যে কথাটা কান্না হয়ে বোবার মতন ঘুরে বেড়ায় বুকে
উঠ্‌ল ফুটে বাঁশির মুখে।
বাঁশির ধারেই একটু আলো, একটুখানি হাওয়া,
যে-পাওয়াটি যায় না দেখা স্পর্শ-অতীত একটুকু সেই-পাওয়া।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্র্যাক্‌টিকাল।

—:*:—

ইংরেজি লেখকের বইতেই পড়েছি যে ইংরেজ ideaকে অবিশ্বাস করে থাকে—"The philosopher proceeds from the abstract to the concrete. The Englishman starts with the concrete and may or, more probably, may not arrive at the abstract.....he mistrusts education. For education teaches how to think in general and that isn't what he wants or believes in.....Hence his contempt and even indignation for individuals or nations who are moved by ideas. He cannot endure the profession that a man is moved by high motives .....The words "hypocrite" "humbug" "sentimentalist" spring readily to his lips.....for intellect he has little use, except so for as it issues in practical results. He will forgive a man for being intelligent if he makes a fortune but hardly otherwise"—অর্থাৎ ইংরেজরা হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে, প্র্যাক্‌টিকাল জাত। দীর্ঘকাল ইংরেজের সহিত সহবাসের ফলে practical এবং efficient হবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জেগে উঠেছে। যদি ভীষণ কাজের

লোক হওয়াটা আমাদের একেবারে আদর্শ না হয়ে উঠ্‌ত তা হলে ভয় পাবার কোন কারণ ছিল না—কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে কাজ সম্বন্ধে আমাদের উৎসাহটা তার স্বাভাবিক মাত্রা একেবারে পেরিয়ে গেছে। ইংরেজের কাছ থেকে কাজের অনেক গুণগান শুনে শুনে এবং অকেজো বলে অনেক খোঁটা খেয়ে খেয়ে ঐ কাজের লোক হওয়াটাই আমরা আমাদের চরম আদর্শ বলে ধরে নিয়েছি।

কিছু দিন পূর্ব্বে শিক্ষা-কমিশন যখন এদেশের অধ্যাপকদের কাছ থেকে শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে তাঁদের মতামত চেয়েছিলেন তখন শিক্ষার আদর্শ অর্থাৎ জাতীয় আদর্শ যে কি হওয়া উচিত, সে বিষয় আমাদের চিন্তা করতে হয়েছিল। এ কথা গোপন করা অসম্ভব যে তাতে আমরা বেশ একটু বিপন্ন বোধ করেছিলুম, কারণ বহুকাল ধরে অন্য ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা না করাতে, চিন্তা করাটা আমাদের অনভ্যাস হয়ে পড়েছে। বিশ্ব-বিদ্যালয় বই নির্ব্বাচন করেন, আমরা সে গুলো দাগ দিয়ে, নোট লিখিয়ে মুখস্থের জন্য তৈরী করে দি। Shakespeare সম্বন্ধে Dowden কি চিন্তা করেন, Raleigh কি বলেন, Hazlitt কি বলেন, আবার আমাদের "An Experienced Professor"ই বা কি লেখেন, এই সব দেখে শুনে যা হোক একটা নোট লেখাই। Cowper পড়াই—Sofa কবিতার বিশেষত্ব কি তা বোঝাই, John Gilpin-এর রসিকতা সম্বন্ধে এমন একটা নোট দি যা মুখস্থ করতে গিয়ে ছেলেদের মন করুণরসে আপ্লুত হয়ে ওঠে। তারপরে মাসকাবারে মাইনে নিয়ে মেয়ের বিয়ের দেনার সুদটা শোধ করবার চেষ্টা করি। এমনি করে দেশের শিক্ষাকে বহন করে আমরা চলি—এর মধ্যে হঠাৎ কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে Shakespeare

পড়াও কেন, Cowper পড়ে লাভ কি তখন ভেবে কুল পাই নে। তবু মনে একটা ক্ষীণ আশা থাকে যে পুরোনো নোট দেখলে Cowper's place in the English literature সম্বন্ধে একটা কিছু পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি কোন অস্বাভাবিক কৌতূহলী ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে শিক্ষার প্রয়োজন কি শিক্ষার আদর্শই বা কি, তখন হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরোয় "প্রকৃত শিক্ষা যে কি মূল্যবান বস্তু তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, শিক্ষাই মানুষকে নিম্ন-প্রাণীদের সহিত পৃথক করাইয়া দেয় ইহা চোরে চুরি করিতে পারে না" ইত্যাদি। ছাত্রদের প্রবন্ধ সংশোধন করতে গিয়ে এ কথাটা এতবার বলেছি যে ও-কথাটা না বলে থাকা একটু কষ্টকর। কিন্তু শিক্ষা-কমিশনের মর্জ্জির কথা বলা যায় না তাঁরা হয়ত ঠিক এ রকম উত্তর চান নি এই সন্দেহে আমরা অন্য উত্তর দেওয়াই স্থির করলুম।

নিজেদের শিক্ষার কথা স্মরণ করে শিক্ষার উপর আমাদের কোনই শ্রদ্ধা ছিল না, তা ছাড়া দেখেছি যে শিক্ষার ফলে আর যাই হোক সকলের ভাগ্যে গাড়িঘোড়া চড়া চলে না। অতএব বল্লুম—আর কিচ্ছু নয়, আমাদের দেশে এই কাব্য সাহিত্য দর্শন, abstract science, প্রভৃতি যা পড়ান হচ্ছিল তা বন্ধ করে দাও, ওতে কোন লাভই হয় না। এই সমস্ত স্কুল কলেজ উঠিয়ে দিয়ে কেবল technical college কর এবং সবাইকে জোর করে techenical science শেখাও দেশ খেয়ে বাঁচবে; কলকাতার বাড়ীওয়ালার তাগাদা সহ্য করতে হবে না এবং মেয়ে বিয়ে দিতে কষ্ট পাবে না। যাঁরা এই রকম উত্তর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেক বৈদান্তিক, দার্শনিক, সাহিত্যের অধ্যাপক, নীতিশিক্ষার উৎসাহী এবং মোটামুটি আধ্যাত্মিক ব্যক্তি আছেন।

অধ্যাপকেরা শিক্ষার বিষয় যে দেশের ঠিক মনোভাবই প্রকাশ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

যেদিন ইয়োরোপ বাষ্প-দৈত্যটাকে বশ করবার মন্ত্র লাভ করলে, সেদিন এসিয়া পড়ল একদম পিছিয়ে। আর ইয়োরোপের বাণিজ্য-তরীতে নীলসাগর ভরে গেল, দেশ দেশান্তর থেকে মণি মুক্তা সঞ্চয় করে ইয়োরোপের অধিবাসীরা তাদের মাতৃভূমিকে সমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত করলে। তার শতঘ্নী কামান, তার দ্রব্য সম্ভার, তার রণতরী, তার আত্মশ্লাঘা, তার অসীম প্রতাপ আমাদের চমক লাগিয়ে দিল। আমরা ভাবলুম ইয়োরোপ যখন বাণিজ্য-লব্ধ অর্থ দ্বারা বড় হয়েছে অতএব আমরা যদি বড় হতে চাই তবে আমাদেরও ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে—ও ভিন্ন উপায় নাই। অতএব দূর করে দাও তোমার সাহিত্য, তোমার কাব্য, তোমার দর্শন। যাতে করে আমরা জাতকে জাত কামার কি তাঁতি হয়ে উঠতে পারি তাই কর।

এমনি করেই ইয়োরোপের দৃষ্টান্ত আমাদের মনকে বিগড়ে দিচ্ছে। খবরের কাগজে বক্তৃতায় আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আমাদের গর্ব্বের ত অন্ত নেই অথচ দেখি ভবিষ্যৎ আদর্শ স্থির করবার বেলায় সবাই বলেন রেখে দাও তোমার আধ্যাত্মিকতা, ওই করেই ত এই হয়েছে, এখন কি করে একদিন সমস্ত পৃথিবীর সকল বাজার আমরা একচেটে করব সেই কথা ভাব। সবাই বলছি দেশের লোককে কাজের লোক করে তুলতে হবে। এই ত দেখতে পাচ্ছি ব্যবসা শেখাবার জন্যে বিশ্ব-বিদ্যালয় নূতন আয়োজন করা স্থির করেছে। এই অর্থের প্রয়োজন এবং সেই নিমিত্ত ব্যবসার প্রয়োজনকে আমি অবহেলা করছি না কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি পাট কেনাবেচার কৌশল শেখা উচ্চ শিক্ষার

একটা অঙ্গ না কি? পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে তিসির ও ভুসির কিরূপ চাহিদা (demand) তাই জানা কি মনুষ্যত্ব লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন? আধ্যাত্মিক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করবেন খেতেই যদি না পেলে তবে বাঁচবে কি করে—আমি বলব খাওয়াটা আমি ভুলছি না এবং মানুষের পক্ষে ওটা ভোলাও সহজ নয়, কিন্তু যেটা ভোলা সহজ সেটা হচ্ছে এই যে আহার্য্য সঞ্চয়টাই মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়।

বহুদিন হতে ইংরেজী শিখে আসছি এবং Shakespeare, Burke পড়ছি, হঠাৎ উপদেশ শুনলুম যে ওসব পড়া, সময়ের অপব্যয় মাত্র, ওতে কাজের কোন সুবিধাই হয় না। তার চেয়ে ইংরেজী বিশুদ্ধ ভাবে বলতে শিখলে চাকরী প্রভৃতির সুবিধা হত। অমনি দেখলুম সিনেটে প্রস্তাব হয়েছে যে, ইংরেজী বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য একটা ডিপ্লোমা দেওয়া হোক। সিণ্ডিকেট এই উচ্চারণের বিশুদ্ধতার প্রয়োজন এমন করে অনুভব করলেন এবং সাধারণ লোকদের এ বিষয়ে এত অযোগ্য মনে করলেন যে, তাঁরা নিয়ম করলেন, গ্র্যাজুয়েট ভিন্ন অপর কেউ এ পরীক্ষা দিতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের বোধ করি এই বিশ্বাস যে, Photo বলতেই কোথায় accent দিতে হয় আর Photography বলতেই বা কোথায় দিতে হয়, এটা যে একটা বিশেষ বিদ্যা কেবল তা নয়—এ বিদ্যা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তবে কথা এই যে, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় কর্ত্তাব্যক্তি এ পরীক্ষা দিয়ে জনসাধারণকে উৎসাহিত না করেন তবে খুব সম্ভবত দেশের লোক ও ডিপ্লোমায় মোহিত হবে না, কারণ ইংরাজি ভাষায় জবান-দুরস্ত করবার দিকে মানুষের মন আর নেই।

কিছুদিন হ'ল আমরা যখন প্রাথমিক শিক্ষার কথা ভাবতে সুরু করেছিলাম তখন মনে করেছিলাম যে, দেশের লোককে খানিকটে chemistry botany, শিখিয়ে দিলেই দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল culture নয় agriculture। কিন্তু মানুষ কি কেবল ফসল-উৎপাদনের ও কাপড়-তৈরীর কল? মানুষের মনুষ্যত্ব কি এতই সুলভ যে, তা লাভের জন্য কোন চেষ্টারই প্রয়োজন নেই। আজ অনেক দিন ধরে ইয়োরোপে প্রাথমিক শিক্ষা চলে এসেছে কিন্তু দেখা গেল তাতে বিশেষ কোন ফল হল না। এবং এ বিষয়ে সে দেশের দু একজন লেখকের লেখায় অসন্তোষও প্রকাশ পেয়েছে।

বিলাতের ও আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে তফাৎ আছে তা অনেকেই জানেন—ইংলণ্ডের জনসাধারণের একটা প্রিয় গান হচ্ছে—"Let's all go down the Strand and have a bannana"; কলা পৃথিবীর অবশ্য সকল দেশের লোকেই খায় এবং আমরা সম্ভবত বেশীই খাই, কিন্তু তাই বলে এদেশের নিরক্ষরেরাও ওব্যাপারটাকে সঙ্গীতের বিষয় করে তোলে নি। এই যে আমাদের নিরক্ষরদের মনের একটু স্বাভাবিক উচ্চতা, ও আভিজাত্য আছে তার কারণ কি? অথচ দেখতে পাই যে, বিলিতি কৃষকেরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে সব আলু কফি উৎপাদন করে তা উৎপাদন করা আমাদের দেশের কৃষকের অসাধ্য। তার কারণ এই যে, যদিও ভারতবর্ষের কৃষক জানেনা যে, কোন জমিতে কোন সার দিতে হয়, তারা জানে যে অযোধ্যা নগরে রামচন্দ্র একদিন পিতৃসত্য পালন করবার জন্যে রাজমুকুট ত্যাগ করে বনবাসে গিয়েছিলেন—রাবণের

অশোক বনে বন্দিনী সীতার কাহিনীও তারা শুনেছে—রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের শৌর্য্য তাদের কাছে কাহিনী মাত্র নয়—তাঁদের স্মৃতি অলক্ষ্যে তাদের মনকে যুগপৎ কোমল ও উজ্জ্বল করে তুলেছে। তাই এত যে পঙ্কিলতা তবু হরিসংকীর্ত্তনে লোক জোটে; যাত্রাগানে, ধ্রুব-উপাখ্যান ভালই লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই হোক আর প্রাথমিক শিক্ষাই হোক ব্যবসার সঙ্কীর্ণ আদর্শে শিক্ষাকে ছোট করে দিলে, দেশের মঙ্গল হবে না, কারণ তাতে দেশের মন ক্রমশ ইতর হয়ে পড়বে।

কাজের একটা ভীষণ আদর্শ চোখের সামনে রাখাতে যে কেবল শিক্ষার আদর্শকে ছোট করে দিয়েছি তা নয়—বাংলাদেশের মনে সকল ব্যাপারেই একটা আক্ষেপ উঠেছে যে, এখানে লেখক পাওয়া যায়, কবি ত খুবই সুলভ, বক্তা সবাই, কিন্তু যাকে বলে practical, business-man তা পাওয়া সহজ নয়। আক্ষেপ করে এই কথা বলি যে, এই যে এত বড় স্বদেশীর ঢেউটা এল,—কি হল তাতে? আর দেখ দেখি বোম্বাই, মিল বসিয়ে কেমন লাভ করছে, বাঙ্গালী বক্তৃতা দিলে গান গাইলে, বাস্ হয়ে গেল সব। এই সব লোক হয়ত একদিন এই বলে আক্ষেপ করবেন যে, সূর্য্যের আলো ধরে তাঁরা তাঁদের গার্হস্থ্যের চুলোটি জ্বালাতে পারছেন না।

এই practical efficiency প্রভৃতির মোহ যতদিন ধরেছে, ততদিন থেকে যেমন কাজের উপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে অমনি আফিসের উপর শ্রদ্ধাও বেড়ে গেছে। আফিস আমাদের মন হরণ করেছে কারণ আমরা ভাবি যে, ঐ আফিস করার গুণেই ইংরেজ এত বড়। অথচ এই efficiency-টাই বা কি? দশটা থেকে পাঁচটা

শাদা খাতা থেকে কালো খাতায় কখনও বা কাল কালীতে কখনও বা লাল কালীতে নকল করা এবং এইটেই খুব শৃঙ্খলার সহিত করার নামই ত efficiency, আর practical মানে যে কাজ করা কঠিন তাতে হাত না দেওয়া। কাজের চেয়ে কাজের শৃঙ্খলাই যে বড় একথা স্বীকার করা কঠিন, তবুও দেখছি শিক্ষাগুণে efficiency-র আদর্শে আমরা ভারি মোহিত হয়েছি। Idealism নয়, Vision নয় efficiency এবং practical হওয়া আমাদের জাতীয় আদর্শ হয়ে উঠেছে। Idealism-কে আমরা অশ্রদ্ধা করতে শিখেছি—নেতাদের বলছি Idea দিয়ে কি হবে—Practical কিছু বলতে পার ত বল, লেখককে বলছি ম্যালেরিয়া কিসে দূর হয় সেই কথা লেখ, না হলে ছেড়ে দেও তোমার লেখনী। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগ হতে, আফিস বড়। অধ্যাপক এবং কেরাণীর সংখ্যা প্রায় সমান। কলেজে দেখতে পাই আফিস সুচারুরূপে চালানই হচ্ছে অধ্যক্ষের প্রধান কর্ত্তব্য। আফিসের বড়বাবু হওয়ার যোগ্যতাই সব চেয়ে বড় যোগ্যতা। রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখছি যে, যাঁরা বিশ ত্রিশ বৎসর নিপুণ ভাবে চেয়ার সাজিয়ে এসেছেন, চাঁদা আদায় করেছেন অথবা চাঁদোয়া খাটিয়েছেন, তাঁরা বলছেন তাঁরাই নেতা কারণ তাঁরা practical! কলেজেও প্রধান কেরাণীর প্রতাপ অধ্যক্ষের চেয়ে কম নয়।

স্কুলে Plain living and high thinking সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখেছি—চাণক্য-শ্লোকে অর্থের অনর্থতা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ পেয়েছি এবং জাতীয় আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা শুনেছি, অথচ আমাদের মনে ভাবী-ভারতবর্ষের যে আদর্শ গড়ে

উঠেছে, সে হচ্ছে এমন একটা ভারতবর্ষ, যাতে শুধু কাপড় বোনা হচ্ছে, জুতো তৈরী হচ্ছে—চার পাঁচ তালা বাড়িতে, কলের চিমনীতে আকাশ ঢাকা যার সমস্ত দেহটা চা, পাটের বিজ্ঞাপনে একেবারে আবৃত—সাহিত্য দর্শন যেখানে নির্ব্বাসিত, অকেজো বিজ্ঞান যেখানে অপমানিত। আর দেশের লোক Stock Exchange ভিড় করে দিব্বি সুখে জীবনযাপন করছে, আর আমাদের ছেলেরা স্কুলে কলেজে শিখছে শুধু Type-writing আর Book-keeping !

কিন্তু উপবাসের দিনে যাই মনে করি না কেন, এ আদর্শ আমাদের দেশে চলবে না। যে আত্মা অজর অমর, যে আত্মা অমৃতের অধিকারী, তাকে বিনষ্ট করে মানুষকে একটা সস্তা জিনিষ উৎপাদনের কলে পরিণত করতে ভারতবর্ষ সজ্ঞানে কখনও রাজী হবে না। পৃথিবীর সমস্ত বাজার একচেটে করবার প্রলোভনও যদি দেখাও তবু একথা ভারতবর্ষের জাতীয় আত্মা কখনই স্বীকার করবে না যে, দেবতাদের মধ্যে কুবেরই বড়, আর জাতির মধ্যে বৈশ্যই শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়।

সমুদ্রের ডাক।

—:*:—

সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে দক্ষিণা যখন পুত্র সন্তানটী প্রসব করলে তখন তাদের সেই এতদিনকার বিষাদঘেরা কুটীর খানি আনন্দের আলোতে হেসে উঠ্‌ল। সাগরের কিনারে তাদের কুটীর। আবহমান-কাল থেকেই ত নীলাম্বুরাশি উচ্ছ্বসিত—সৃষ্টি হতেই ত তার তরঙ্গমালা কল কল ছল ছল মুখর—আজও তাই। তবে সে তরঙ্গমালার কল কল ধ্বনিতে আজ এত আনন্দ-মদিরা ঢেলে দিলে কে? নীলাম্বুরাশির সে উচ্ছ্বাস আজ এত হাস্য-মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল কেন? কুটীরের আশে পাশে তালবৃক্ষের সারি। বাতাসে তালবৃন্ত থির্ থির্ করে কাঁপছে—কিন্তু তা আজ এত উল্লাস-যুক্ত হ'ল কোন্ মন্ত্রে? দক্ষিণা যখন তার সাঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল তখন এমনি করে মৎসজীবীর সেই নির্জ্জন শান্ত অথচ বিষাদমাখা কুটীর খানি, আকাশ বাতাস দশদিক ভরে একেবারে হেসে উঠ্‌ল।

দক্ষিণা যখন পুত্র সন্তানটি প্রসব করলে তখন শ্রীমন্তের হৃদয়খানি ভক্তিতে ভরে' উঠ্‌ল এবং তারই আলোক তার চক্ষু দুটিকে উদ্ভাসিত করে' তুল্‌ল। দেবতার দয়া তার অন্তরের অন্তস্থলে গিয়ে স্পর্শ করে' শ্রীমন্তের জীবনকে এক মুহূর্ত্তে কৃতার্থ করে' দিল। জোড়করে আকাশের পানে চেয়ে গদগদভাবে শ্রীমন্ত বল্‌ল—"দেখো ঠাকুর! আমার খোকাকে যেন বাঁচিয়ে রেখ—দেখো যেন আকাশের চাঁদ হাতে

দিয়ে আবার তা কেড়ে নিয়ো না”—শ্রীমন্তের মুখে আর কথা সর্‌ল না —তার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল—অন্তরের ভাব, ভাষা খুঁজে পেলে না!

যথাসময়ে অন্নপ্রাশনের সঙ্গে শিশুর নামকরণ হ'য়ে গেল। দেবতার দান বলে' তার নাম রাখা হ'ল 'প্রসাদ'। যেদিন শিশু প্রথম আধ আধ কথায় মা ও বাবা ডাক্‌তে শিখ্‌ল, সেদিন দক্ষিণা ও শ্রীমন্তের বুকের ভিতরটা আশায় আনন্দে কেঁপে উঠ্‌ল—এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখের সাম্‌নে একটা নতুন জগৎ খুলে গেল। যে জগতে পিতৃ-মাতৃ হৃদয়ে এত স্নেহ এত ভালবাসা—সে-জগতের ত কঠোর হবার অবসর নেই। যে সংসারে শিশু রয়েছে—তার আধ আধ কথা রয়েছে—কালো চোখের হাসিমাখা দৃষ্টি রয়েছে—সে সংসারের ত নির্ম্মম হবার সাহস নেই। শ্রীমন্তের মরুভূমির মতো সংসার এক মুহূর্ত্তে যেন মন্দাকিনীর প্রবাহে দ্রুমদল শোভিত হ'য়ে গেল। আর সে ক্লান্তি-নেই, দুঃখ নেই, দৈন্য নেই—আর সে ব্যর্থতা নেই। শিশুর আনন্দ-ময় স্পর্শে সমস্তই ধন্য ও সার্থক হ'য়ে উঠ্‌ল।

প্রতিদিনের কাজগুলো যা এতদিন শ্রীমন্ত ও দক্ষিণার কাঁধে ভূতের বোঝার মতো চেপে তাদের জীবনকে এখানে সেখানে নির্ম্মম ভাবে টেনে নিয়ে বেড়াত, সে-ভার শুধু একটী মাত্র শিশুর আবির্ভাবে একেবারে লঘু হ'য়ে গেল। শ্রীমন্ত যখন জাল কাঁধে নিয়ে মাছ মার্‌তে যায় তখন তার হৃদয়টা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই আজকাল নৃত্য কর্‌তে থাকে—শ্রীমন্ত তখন ভাবে যে এই দিনমানব্যাপী পরিশ্রমের যে পুরস্কার, সে-পুরস্কার এ পরিশ্রমের তুলনায় অনেক বেশী। সে-পুরস্কার একটি ক্ষুদ্র শিশুর স্পর্শ—একটি ক্ষুদ্র শিশুর মুখে বাবা-ডাক। দক্ষিণা যখন রন্ধনে যায় তখন আর সে তা যন্ত্রবৎ সম্পাদন

করে না। রন্ধনের প্রতি ব্যঞ্জনটি যে, একটি ক্ষুদ্র শিশুর আনন্দের সামগ্রী হবে! সমস্ত দিনটার দিকে চেয়ে দক্ষিণার আর তা মরুভূমি বলে' মনে হয় না। সমস্ত দিনমান যে সে অনেকগুলো স্নেহের কাজের অধিকারিণী। শিশুকে স্নান করান—আহার করান—ঘুম পাড়ান তা যে দক্ষিণাকেই কর্‌তে হবে। ধন্য ভগবান! যিনি শিশুকে অসহায় করে' এখানে এনেছেন। পিতামাতা একটি ক্ষুদ্র শিশুর কাছ থেকে যে কতখানি আনন্দ কুড়িয়ে নেয়—তা শিশুও বোঝে না আর পিতামাতাও জানে না!

প্রসাদ ধীরে ধীরে ছ' বছরে পড়্‌ল।

একদিন রাতে ঘরের ভিতরে অসহ্য গরম বোধ হওয়ায় দক্ষিণা ঘরের দাওয়ায় একখানি মাদুর বিছিয়ে শয়ন করেছে। পাশে প্রসাদ। ভোরের মুখে দক্ষিণার ঘুম ভেঙে গেল। তখন একটি মাত্র কাক ডেকেছে—সমুদ্রের আর আকাশের যেখানে মিলন হয়েছে সেখানে কেবল একটি মাত্র রেখা শুভ্র হ'য়ে উঠেছে। শ্রীমন্ত তারও আগে জাল নিয়ে বেরিয়ে গেছে। দক্ষিণা তাড়াতাড়ি উঠ্‌তে যাচ্ছে, হঠাৎ তার চোখ পড়ে' গেল প্রসাদের মুখের উপর। দক্ষিণার আর ওঠা হ'ল না। প্রসাদকে ত সে এমন কোন দিন দেখে নি! নিদ্রিত শিশুর হাত দুটো সন্তর্পনে তার বুকের ওপর ন্যস্ত। চোখ দুটো ফুলের পাঁপড়ির মতো নিমীলিত। আর ঠোঁট্ দুখানিতে একটী মৃদু—অতি মৃদু হাসির রেখা! দক্ষিণা কি প্রসাদকে আর কোন দিন নিদ্রিত অবস্থায় দেখে নি?—দেখেছে'; কিন্তু সে-প্রসাদে আর এ-প্রসাদে যেন আকাশ পাতাল তফাৎ। আর কি কোন দিন সে প্রসাদকে হাস্‌তে দেখে নি?—দেখেছে; কিন্তু সে হাসিতে আর আজকার এই

নিদ্রিত শিশুর মৃদু হাসি টুকুতে যে কি প্রভেদ তা দক্ষিণা বল্‌তে পারে না—কিন্তু সে-হাসি আর এ-হাসি এক নয়। এ কি দক্ষিণার পুত্র—না কোন দেবশিশু! এ কি এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র পিতা মাতার স্নেহাবদ্ধ সন্তান—না অনন্ত আকাশের কোন জীব! এ কি মর্ত্ত্যের মানুষ—না স্বর্গের দেবতা! দক্ষিণার কেমন ভয় কর্‌তে লাগ্‌ল। তাড়াতাড়ি ডাক্‌ল—"প্রসাদ, প্রসাদ।"

দক্ষিণার ডাকে যখন প্রসাদের ঘুম ভেঙে গেল তখন সে চারদিকে চেয়ে যেন প্রথম কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ল না, তারপর হঠাৎ তার মাকে দেখ্‌তে পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে' বল্‌ল—"জানিস্ মা ভারি একটা মজার স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম।

দক্ষিণা শিশুকে বক্ষে চেপে তার দুই গালে হাত বুলিয়ে বুঝ্‌ল এ তারই প্রসাদ বটে—জিজ্ঞেস্ কর্‌ল—"কি স্বপ্ন বাবা?"

"ভারি মজার স্বপ্ন মা! সে কি যেন কেমন—একদিন যেন আমি খেল্‌ছিলাম—সেখানে সবাই আছে মা—নরু অনঙ্গ বৈকোণ্ঠো শশী তারক—সবাই। হঠাৎ দেখি কেউ নেই! একলা আমি খালি দাঁড়িয়ে আছি—আর আমার সাম্‌নে মা খালি নীল—আর নীল—আর নীল! আর সেখানে থেকে কে যেন খালি ডাক্‌ছে—'প্রসাদ প্রসাদ', আমি উত্তর দিতে যাই আর পারি না—হাঁট্‌তে যাই হাঁট্‌তেই পারি না। আচ্ছা স্বপ্নে এ রকম হয় কেন মা? হাঁট্‌তে গেলে হাঁট্‌তে পারি না—কথা বল্‌তে পারি না?"

"কি জানি বাবা কেমন করে' বল্‌ব স্বপ্নে কেন ওরকম হয়।"

"তারপর আরও কত যেন কি—সব আমার মনেই নেই। কত যেন সুন্দর সুন্দর দেশ—কত ঘর বাড়ী—ফুল ফল—কত যেন কি।

সে এমন সুন্দর—সব বুঝি পরীদের দেশ—পরীদের দেশ কোথায় মা?"

"কি জানি বাবা তাদের দেশ কোথায় তা ত কেউ জানে না। তারা থাকে আকাশে—আকাশে আকাশেই ঘুরে বেড়ায়—তাদের দেশ কোথায় তা ত কেউ জানে না।"

প্রসাদ সন্দেহাকুল চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে দেখ্‌ল। শিশুর চোখে পড়্‌ল শুধুই আকাশ—অনন্ত শূন্য—আর কিছুই না। শিশু একটু ম্রিয়মান হ'ল। হায় পরীদের দেশ কোথায় তা কেউই জানে না!

সে-দিন রাত্রিতে ভীষণ তুফান উঠ্‌ল। কালো কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল—থেকে থেকে বিদ্যুৎ তাদের গায়ে দাঁত বসিয়ে দিতে লাগ্‌ল। দিগন্তের পার থেকে সাঁ সাঁ করে' বাতাস ছুট্‌ল—সেই বাতাসের নাড়া খেয়ে লক্ষ্য ঢেউ যেন লক্ষ নিদ্রিত অজগরের মতো জেগে উঠে, তাদের লক্ষ্য ক্রুদ্ধ ফণা তুলে বেলাভূমে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে পড়তে লাগ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। অর্দ্ধপ্রহর রাত থাক্‌তে জল ঝড় থেমে গিয়ে, প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ কর্‌ল। দক্ষিণার যখন ঘুম ভাঙ্‌ল তখন পূর্ব্বদিকে ক্ষীণ উষার আলো দেখা দিয়েছে—আঁধার তখনো গাছে গাছে, তাদের ডাল পালার পাশে পাশে, ঘর বাড়ীর কোণে কোণে আশ্রয় খুঁজে আরোও কিছুকাল থাক্‌বার প্রয়াস পাচ্ছিল। দক্ষিণা উঠে ছড়া দিয়ে উঠান ঝাঁট দিল। তখন চারদিক বেশ ফর্‌সা হয়ে এসেছে। দক্ষিণা গিয়ে প্রসাদকে ডেকে তুল্‌ল—বল্‌ল—"কাল রাতে ঝড় হ'য়ে গিয়েছে—চল্, ঝিনুক কুড়ুতে যাবি নে?" প্রতি ঝড়ের শেষে সমুদ্রের প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে যে-সব মরা

ঝিনুক ইত্যাদি বেলা-ভুমে পড়ে' থাক্‌ত দক্ষিণা তা কুড়িয়ে বেশ দু' পয়সা উপায় কর্‌ত। কখনও কখনও বা দু' একটা বড় শঙ্খ বা কড়িও মিলে যেত। তা অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা বেশ দাম দিয়ে কিনে নিত। দক্ষিণা তাড়াতাড়ি প্রসাদকে কাপড় পরিয়ে দিল। তারপর কুটীরের দরজাটি টেনে দিয়ে মাতা এবং পুত্রে বের হ'য়ে পড়্‌ল।

ছোট বড় নানা রঙের নানান্ আকৃতির ঝিনুকে যখন দক্ষিণার ঝাঁকাটী পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল তখন সমুদ্রগর্ভস্থিত সূর্য্যের ক্রুদ্ধ রশ্মিগুলো পূর্ব্বদিগন্তে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মেঘমালা তীরের মতো ভেদ করে', ঊর্দ্ধে নীলিমায় আপনাদের ছড়িয়ে দিয়েছে। ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে তারা সমুদ্রের ধারে ধারে অনেকদূর গিয়ে পড়েছিল। ফিরবার পথও সেই সমুদ্রের ধারে ধারে। দক্ষিণা বাম কাঁকালে ঝিনুকপূর্ণ ঝাঁকাটী বহন করে', দক্ষিণ হস্তে প্রসাদের ক্ষুদ্র হস্তটী ধারণ করে' ছেলের সঙ্গে গল্প কর্‌তে কর্‌তে বাড়ী ফিরে চল্‌ল।

মাতা পুত্রে কথোপকথন কর্‌তে কর্‌তে চল্‌ছিল আর শিশুর চঞ্চল চোখ দুটী এদিক সেদিক ফির্‌ছিল। একবার প্রসাদ সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখে, তারপর বলে উঠ্‌ল—"দেখ্ দেখ্ মা কেমন একখানা জাহাজ কতদূর দিয়ে ছুটে চলেছে"—কিন্তু পরক্ষণেই তার উত্তোলিত অঙ্গুলি দাঁত দিয়ে কাম্‌ড়ে ধরে' একেবারে দাঁড়িয়ে গেল—শিশু যেন কি স্মরণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। সহসা আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে বলে' উঠ্‌ল—"মা জানিস!"

দক্ষিণাও প্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—বল্‌ল—"কি বাবা?"

"সেই যে সে-দিনকার স্বপ্ন।"

"হাঁ বাবা"

"খালি নীল—আর নীল—আর নীল!"

"হাঁ বাবা"

শিশু তার ক্ষুদ্র হস্তের ক্ষুদ্র অঙ্গুলি সমুদ্রের দিকে প্রসার করে' বল্‌ল—"সে যেন ঐ রকম মা।"

"ছি ছি বাবা স্বপ্ন সব মিথ্যে।—স্বপ্নের কথা মনে করে' রাখ্‌তে নেই।"

দক্ষিণা প্রসাদকে টেনে নিয়ে গৃহ-অভিমুখে অগ্রসর হ'ল। শিশুও অন্যমনস্ক ভাবে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল। সে মনে ভাব্‌লে হায়! স্বপ্ন সব মিথ্যে এমন মজার জিনিসগুলো মিথ্যে হয় কেন? এই ভেবে সে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'ল।

সে দিন বেলা এগারটা বেজে গিয়েছে। গ্রামের উপকণ্ঠে যে মস্ত ছাতিম গাছটা ছাতার মতো ডাল বিস্তার করে' পাতা বিছিয়ে দিব্যি ছায়া করে' দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে তখনকার মতো খেলা ধূলো সাঙ্গ করে' ছেলেরা যে যার মতো গৃহে ফিরেছে। কিন্তু প্রসাদের আর সেদিন দেখা নেই। দক্ষিণা রান্না শেষ করে' তেলের বাটী নিয়ে প্রসাদের জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিল। ধীরে ধীরে যখন উঠানের কোণের ডালিম গাছটার ছায়া তার গায় গায় মিশে গেল অথচ প্রসাদ ফির্‌ল না তখন দক্ষিণা তার খোঁজে চল্‌ল। দক্ষিণা সহজেই মনে কর্‌ল যে প্রসাদ হয়ত আর কোন বালকের সঙ্গে তাদের বাড়ীতে গিয়েছে। কিন্তু যখন সমস্ত প্রতিবেশীদের বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে প্রসাদের খোঁজ মিল্‌ল না তখন তার মার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু দক্ষিণা আবার মনে কর্‌ল যে হয়ত প্রসাদ এতক্ষণ ঘরে ফিরেছে।

এই মনে করে' দক্ষিণা দ্রুতপদে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌ল। না,—কুটীরের দ্বার তেম্‌নি রুদ্ধ। কেউ কোথাও নেই। আশে পাশে কোন খানে প্রসাদ থাক্‌তে পারে মনে করে' দক্ষিণা উচ্চৈঃস্বরে ডাক্‌ল "প্রসাদ প্রসাদ", কোন উত্তর নেই। প্রসাদ ফেরে নি।

ত্রস্তপদে দক্ষিণা আবার বাটী থেকে বহির্গত হ'ল। আবার পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌তে লাগ্‌ল। কোথাও প্রসাদ নেই। এমনি করে' যখন দক্ষিণা চতুর্থবার গৃহ থেকে গৃহান্তরে কেঁদে কেঁদে প্রসাদের খোঁজ করে' বেড়াচ্ছিল তখন একটি ছোটছেলে দক্ষিণাকে বল্‌ল যে, প্রসাদ খেলার মাঝখানে ছাতিমতলা থেকে চলে' গিয়েছিল—আর তার যদ্দূর মনে পড়ে তাতে সে প্রসাদকে ছাতিমতলা থেকে যে পথটী সমুদ্রের দিকে গিয়েছে সেই পথ ধরে' তাকে যেতে দেখেছে। দক্ষিণা মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না করে' দেবতার কাছে নানা মানত কর্‌তে কর্‌তে চল্‌ল। ছাতিমতলায় এসে দেখ্‌ল সে স্থান জনশূন্য। দক্ষিণা সেখান থেকে যে-পথ সমুদ্রের দিকে গিয়েছে সেই পথ ধরে' চল্‌ল। কিছুকালের মধ্যে দক্ষিণা সমুদ্রের ধারে এসে উপস্থিত হ'ল। সেখানে এসে সে ইতঃস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' যা দেখল তাতে তার চক্ষুস্থির হ'য়ে গেল।

দক্ষিণা দেখ্‌ল সমুদ্রের ধারে একখানে বন্যঝাউ আর নারিকেল গাছে একটী কুঞ্জের মতো সৃষ্ট হয়েছে—আর সেখানে প্রসাদ একটি ঝাউয়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে' একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে। মধ্যাহ্ন-সূর্য্য-উদ্দীপ্ত-আকাশ সমুদ্রকে একটা অতি মনোরম চোখজুড়ান নীল রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। গত রাত্রির ঝঞ্ঝা-তাড়িত ঊর্ম্মিমালা এখনও যেন তাদের তাল সাম্‌লিয়ে উঠ্‌তে পারে নি—তাই

তখনও তারা গর্জ্জে' গর্জ্জে' বেলাভূমে এসে প্রতিহত হ'য়ে ফিরছিল। আর তারই উপকূলে ছায়া-সুনিবিড় কুঞ্জতলে ক্ষুদ্র শিশু আপনার ক্ষুদ্র দুটী হাতে ক্ষুদ্র দুটী হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসে বসে তাই দেখছিল; শিশু পলকহীন—নির্ব্বাক—নিস্তব্ধ!

দক্ষিণা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হ'য়ে প্রসাদকে কি ভর্ৎসনা কর্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রসাদ মানুষের পায়ের শব্দ শুনে চম্‌কে চেয়ে দেখ্‌ল, তারপর মাকে দেখে তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধর্‌ল ও উত্তেজিত ভাবে বল্‌লে—"মা মা শুন্‌ছিস্ কি মা?"

শিশুকণ্ঠের মা-ডাকে মাতার মনের ক্রোধ মুহূর্ত্তে চোখের জলে পরিণত হয়ে গেল। দক্ষিণা প্রসাদকে বক্ষে তুলে নিয়ে মুখচুম্বন করে' জিজ্ঞেস কর্‌ল—"কি বাবা?"

প্রসাদ তেম্‌নি উত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌ল—"ঐ শোন্ শোন্ মা সমুদ্র কেবলি ডাক্‌ছে—'প্রসাদ প্রসাদ।' শুনিস্ না কি মা তুই?"

শিশুর কথা শুনে দক্ষিণার বুক দুরুদুরু করে' কেঁপে উঠ্‌ল। কোন্ অজ্ঞাত আশঙ্কার আশু সম্ভাবনায় তার চিত্ত মন প্রাণ খিন্ন হয়ে উঠ্‌ল। দক্ষিণা বল্‌ল—"ছিঃ বাবা পাগলামি করো না। সমুদ্র কি ডাক্‌তে পারে! ও যে ঢেউয়ের শব্দ।"

দক্ষিণা প্রসাদকে কোলে নিয়ে বাড়ী ফির্‌ল।

এর পর থেকে সুযোগ পেলেই প্রসাদ সেই ঝাউকুঞ্জতলে গিয়ে বসে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকত। এই ক্ষুদ্র শিশুটী সমস্ত খেলাধূলা ফেলে, একা একা সমুদ্রের দিকে চেয়ে কি ভাবে তা কে জানে? সিন্ধুর ছলছলায়িত কলরোল সে ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরতে পরতে কোন্ ভাবের তরঙ্গ তুলে যায় তা কে বল্‌তে পারে? কে জানে

কোন্ রহস্যের যবনিকা ভেদ করে' কোন্ স্বপ্নের সন্ধানে শিশু তার কালো চোখের নির্ম্মল দৃষ্টি সীমাহীন দিগন্তে বদ্ধ করে' সিন্ধুকূলে বসে থাকে? কেউ জানে না। শিশু কি জানে? কে জানে শিশু জানে কি না। কিন্তু তবুও শিশু যায়। একা একা—সমস্ত ছেড়ে খেলাধূলো হাসি-গল্প সমস্ত পরিত্যাগ করে' শিশু যায়, সেই ঝাউকুঞ্জ-তলে আপনাকে ভুলিয়ে দিতে—ভাসিয়ে দিতে—ডুবিয়ে দিতে। ক্রমে ক্রমে দক্ষিণা যখন জান্‌ল যে, প্রসাদ খেলবার নামে প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের ধারে গিয়ে একা একা বসে' থাকে, তখন সে প্রসাদকে প্রথমে মিষ্টি কথায় তারপর ভর্ৎসনায় ও অবশেষে ভয়প্রদর্শনে সেখানে যেতে নিরস্ত করতে চেষ্টা কর্‌ল কিন্তু যখন দেখ্‌ল কিছুতেই কিছু হ'ল না তখন দক্ষিণা হতাশ হয়ে শ্রীমন্তকে একে একে সব কথা বল্‌ল।

এর পর থেকে প্রসাদের বাহুমূল ও কণ্ঠদেশ ত্রিকোণ চতুষ্কোণ ঢোলোকাকৃতি নানা বর্ণের নানা রকমের কবজে ও তাবিজে ভরে' উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কত জনের কত মন্ত্র ঔষধী ইত্যাদির ছড়াছড়ি হতে লাগ্‌ল। কিন্তু প্রসাদের মনের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। ফাঁক পেলেই সে ঐ ঝাউকুঞ্জতলে গিয়ে একলা সমুদ্রের দিকে পলক-হীন নেত্রে চেয়ে থাকে—বুঝি কান পেতে কি শুনতে থাকে। এই রকমে যখন কিছুতেই কিছু হল না—তখন শ্রীমন্ত ও দক্ষিণা পরামর্শ করতে বস্‌ল। অনেক কথাবার্ত্তার পর ঠিক হল যে, দক্ষিণা প্রসাদকে নিয়ে তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন থাকবে। সে আত্মীয়ের বাড়ী সমুদ্রের উপকূল থেকে দশ ক্রোশ দূরে। আর শ্রীমন্ত মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে প্রসাদকে দেখে আসবে। তারপর

একটি শুভদিন দেখে দক্ষিণা ও প্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীমন্ত সেই আত্মীয়ের বাড়ীতে ছেলেকে রেখে তার নির্জ্জন কুটীরখানিতে ফিরে এল।

পৃথিবীর বুকে পুরোণো দাগ মিশিয়ে নতুন দাগ বসিয়ে দশ বছর কেটে গেল। শ্রীমন্ত যখন একদিন দক্ষিণা ও প্রসাদকে সেই আত্মী-য়ের বাড়ী থেকে ফিরিয়ে আনতে গেল তখন প্রসাদের ছেলেবেলার খেয়ালের কথা সবাই ভুলেছে—ভোলে নি শুধু দক্ষিণা। তাই দক্ষিণা যখন শ্রীমন্তকে সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিল—তখন দক্ষিণা যে নিতান্তই একটা পাগলী সেই কথাটাই শ্রীমন্ত তাকে বুঝিয়ে দিল। আরও বুঝিয়ে দিল যে শ্রীমন্তের এখন বয়েস হয়েছে—কবে পর-পারের ডাক আস্‌বে তার ঠিক নেই—প্রসাদকে পৈতৃক ব্যবসাটা ত শিখতে হবে—খাওয়া পরার উপায়টা ত করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই শুভদিন দেখে প্রসাদ ও দক্ষিণা শ্রীমন্তের সঙ্গে আবার তাদের সমুদ্রের ধারে কুঁড়ে ঘরটিতে ফিরে এল। দক্ষিণা হৃষ্ট হয়ে দেখ্‌ল যে সমুদ্র দেখে প্রসাদের কোনই ভাবান্তর হল না। তিন মাসের মধ্যে শ্রীমন্তের শিক্ষায় প্রসাদ একজন পাকা মাঝি হয়ে উঠ্‌ল—জাল টান্‌তে, দাঁড় ফেল্‌তে, পাল খাটাতে প্রসাদের সমকক্ষ আর কেউই সেই ধীবরপল্লীতে রইল না।

• সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমা। রাত্রির এমন রূপ আর কেউ কখনও দেখেনি। লক্ষ পরী বুঝি সেদিন আকাশপথে তাদের প্রিয়ের উদ্দেশে অভিসারে বেরিয়েছিল—আর তাদের লক্ষ গা থেকে বুঝি রূপোর স্বচ্ছ তরল রাগ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল—তাদের লক্ষ হৃদয়ের প্রেমের অনুভব বুঝি আকাশে বাতাসে পৃথিবীর জলে স্থলে বিছিয়ে

যাচ্ছিল—তাদের দু'লক্ষ পায়ের নূপুরের "যে-গান কানে যায় না শোনা"—তাই বুঝি দিগন্তের গায়ে গায়ে মাতলামি করে ফিরছিল।

সেদিন রাত্রির খাওয়া দাওয়া শেষ করে' যখন প্রসাদের কাঁধে জাল চাপিয়ে আপনার কাঁধে দাঁড়, পাল ও পাল তুলবার খুঁটিটা নিয়ে শ্রীমন্ত গৃহ থেকে বের হল তখন পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ আকাশে অনেকখানি উঠে গেছে। তারা দুজনে সমুদ্রের কিনারে এসে তাদের তিন খণ্ড লম্বা পুরু তক্তায় বাঁধা ভেলাটা ডাঙ্গা থেকে জলে নামিয়ে দিল। তারপর পাল খাটাবার খুঁটিটা ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে পাল খাটিয়ে দিল—ভেলা অনুকূল-বাতাসে তর্‌তরিয়ে দিগন্তের পানে যেন উড়ে গেল—ভেলার পিছন দিকটায় প্রসাদ বৈঠা হাতে তার মাথা ঠিক রাখ্‌তে লাগল আর তার আগায় বসে' শ্রীমন্ত জালটা গুছিয়ে রাখতে লাগল।

সেদিন সাগরে রূপোর ও রূপের বাণ ডেকেছিল। দুধের চাইতেও সাদা রূপোর পাত গায় জড়িয়ে রূপসী ঊর্ম্মিবালারা চিক্‌-চিক্‌ ঝিক্‌-ঝিক্‌ করছিল—খিল্‌ খিল্‌ করে' হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। তীরের গাছগুলো যখন ঝাপ্‌সা হয়ে এল তখন ভেলার পাল নামিয়ে নেওয়া হল। তারপর ভেলার পিছন দিকটায় বসে প্রসাদ একটু একটু করে বৈঠা মারতে লাগল আর গলুইয়ের কাছে স্তূপাকৃতি করা জালটা শ্রীমন্ত, ভাঁজ খুলে খুলে জলে নামিয়ে দিতে লাগল।

"জানিস্‌ প্রসাদ, পূর্ণিমে রাত্তিরে যেমন জালে গল্‌দা চিংড়ি পড়ে তেমন আর কখনও না। আর চাঁদ্‌নী রাত যদি মেঘলা মেঘলা হয় তবে কাঁবড়ার লেখাজোকা নেই।" শ্রীমন্ত জাল ফেল্‌তে ফেল্‌তে

অজস্র ব'কে যাচ্ছিল আর প্রসাদ তাই নির্ব্বাক হয়ে শুনে যাচ্ছিল। "জানিস্‌ রে প্রসাদ সেই যেবার আমি তোর মাকে বিয়ে করলাম—সেই সেবার যে এই খালটাতে কোথা থেকে এক পাল হাঙ্গর এসে পড়ল—" "প্রসাদ প্রসাদ" প্রসাদের কানে এসে বাজল কে যেন ঠিক তার পিছন থেকে তাকে ডাকল—"প্রসাদ প্রসাদ"। প্রসাদ চম্‌কে পিছন ফিরে চেয়ে দেখল। কই, কেউ ত নেই! প্রসাদের সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। প্রসাদের মনে পড়ে গেল একটা বহু দিনের কথা—বহুদিনের স্বপ্ন—বহুদিনের আকাঙ্খা। দশ বছর ধরে যার ওপরে বিস্মৃতির কালো পর্‌দা পড়েছিল তা এক মুহূর্ত্তে কোথায় সব ছিন্ন ভিন্ন করে' বেরিয়ে এলো মুক্ত স্পষ্ট উজ্জ্বল। প্রসাদ শ্রীমন্তের দিকে ফিরে দেখল। বৃদ্ধ তেমনি আপন মনে জাল ফেলছিল আর কত কালের কত কথা বলে' বলে' যাচ্ছিল। "প্রসাদ প্রসাদ।" প্রসাদ ফিরে চাইল। সহস্র সহস্র তরুণীর মতো অজস্র ঊর্ম্মিবালার কল কল ছল ছল হাসি—ঐ যে তারাই ডাক্‌ছে—"প্রসাদ প্রসাদ।" চাঁদের আলোয় চিক্‌ মিক্‌ করে উঠে ঐ যে তাদের তরলিত তনু বিভঙ্গিত করে তাদের কমকণ্ঠে ডাক্‌ছে—"প্রসাদ প্রসাদ।" ঐ যে সহস্র কিশোরীর কলহাসির মতো, সহস্র রূপসীর রূপরাশির মতো মাদকতা ছড়িয়ে দিয়ে ডাক্‌ছে—"প্রসাদ প্রসাদ।" এ তাদের কিসের আমন্ত্রণ? কোথায় নেবে তারা? সিন্ধুর কোন্‌ অতল তলে? কোন্‌ রহস্য যবনিকার অন্তরালে? ঐ যে তরঙ্গটি ভেলার গায়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে গেল সে ডাকল—"প্রসাদ প্রসাদ।" ঐ যে লহরীটি বহুদূর হতে দৌড়ে এসে ভেলার কিনারে কিনারে লুটিয়ে গেল, সে ডাক্‌ল—"প্রসাদ প্রসাদ।" প্রসাদ শ্রীমন্তের দিকে চেয়ে

দেখল। বৃদ্ধ তেমনি তার দিকে পিঠ ফিরে জাল ফেলছিল। প্রসাদ ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তার হাতের বৈঠাটী ভেলার ওপরে রেখে দিল। তারপর ধীরে ধীরে তার দু' পা জলে নামিয়ে দিল। ধীরে ধীরে ভেলার কাঠ ধরে আপনাকে জলে নামিয়ে দিল। কোমর, বুক, কণ্ঠ, চিবুক, নাসিকা, চক্ষু, ললাট, মস্তক, মস্তকের কেশরাশি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। দ্বিগুণ উৎসাহে লক্ষ লক্ষ ঊর্ম্মিবালারা চিক্-চিক্ ঝিক্-ঝিক্ করে উঠল—যেখানটায় সাগরের বুক চিরে প্রসাদের সমস্ত শরীরটা অদৃশ্য হয়ে গেল সেখানটার উপর দিয়ে মহা ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল আর খিল্-খিল্ করে' হাসতে লাগল।

"বৈঠে ঠেলছিস্ না ক্যান্ রে প্রসাদ?" যখন প্রসাদের কোন উত্তর মিলল না, তখন শ্রীমন্ত মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখ্‌ল—দেখ্‌ল শুধু শূন্য—প্রসাদ যেখানটায় বসে' ছিল সেখানটা শূন্য—সমস্ত ভেলাটাই শূন্য—শুধুই শ্রীমন্ত—আর কেউ নেই!

মুহূর্ত্তে শ্রীমন্তের হৃদয় থেকে একটা তপ্ত আগুনের ঝলক্ উঠে তার সমস্ত শিরায় শিরায় ছড়িয়ে গেল। শ্রীমন্তের হাত থেকে জালের দড়ি খসে' পড়ল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়িয়ে সংজ্ঞালুপ্ত চোখ দুটো দিয়ে প্রসাদ যেখানটায় বসে ছিল সেখানটায় অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মর্ম্মভেদী চীৎকার করে একবার খালি "প্রসাদ" বলে ডেকে ভেলার উপরে পড়ে গেল। উত্তরে লক্ষ ঊর্ম্মিবালারা চাঁদের কিরণে চিক্-মিক্ করে' লক্ষ নিষ্ঠুরা তরুণীর মতো ভেলার আশে পাশে প্রতিহত হ'য়ে খিল্ খিল্ করে' হাস্‌তে লাগল আর কৌতুক করে' ডাকতে লাগল—"প্রসাদ প্রসাদ!"

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

INDIAN LITERATURE.

By PRAMATHA CHAUDHURI.

[বিলাতের বিখ্যাত সংবাদপত্র Manchester Guardian-য়ের সম্পাদকের অনুরোধে ভারতবর্ষের সাহিত্য সম্বন্ধে আমি একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখি। সে প্রবন্ধটি সম্প্রতি উক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। Manchester Guardian এদেশে দু-চারখানির বেশী আসে না, সুতরাং আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অনেকেই সে প্রবন্ধ পড়বার সুযোগ পান নি। তাঁদের দৃষ্টির জন্যই আমি সেই প্রবন্ধটি "সবুজ পত্রে" প্রকাশ করছি। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, ইংরাজি প্রবন্ধ বাংলা কাগজে ছাপানো কি সঙ্গত? তার উত্তর—আমার ইংরাজি লেখা, আমি নিজে বাংলায় অনুবাদ করতে পারিনে। বাংলায় লিখ্‌লে ও-প্রবন্ধ আমি অন্যরকম করে লিখতুম, সুতরাং ওটি অনুবাদ করতে বসলে আমার হাতে ওর চেহারা একেবারে বদলে যাবে। তা ছাড়া "সবুজ পত্রের" অধিকাংশ পাঠকই ইংরাজি ভাষার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত,—সম্ভবত বাংলার চাইতে বেশী পরিচিত,—সুতরাং সে পত্রের মধ্যে এ প্রবন্ধটি নির্ভয়ে প্রক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।]

INDIAN literature is the creation of the Hindu mind, and so to understand that literature it is necessary to have some knowledge of the thought and institutions of ancient India, as all the roots of our

social and spiritual life are deeply embedded in our past. The complete history of India has yet to be written, but its culture-history has been fully preserved in the pages of Sanskrit literature—a literature which is as vast as it is comprehensive, practically embracing the whole sphere of human thought and imagination.

The earliest chapter of our literature, known as the Vedas, is a collection of hymns addressed to gods—that is to say, personified forces of nature—which express the sentiments of joy and wonder, of reverence and awe born of the living contact of the human mind with the external universe. For freshness of feeling and vigour of expression, there is nothing in any literature which can be compared with these. In them we find also the earliest attempts of the human mind to lift the veil of phenomena and peer into the Reality which is the ultimate basis of all that exists. The Vedas have ever been looked upon by our people as the eternal source of their spiritual and social existence. One thing is certain, that these first words of India indicated the direction in which the Hindu mind was to move, and determined the character of the laws which were to give shape and form to Hindu society, as well as of the philosophy which was to mould Hindu psychology. If the earlier portion of the Vedas was a collection

of hymns, the later portion was a manual of rituals. The Shastras (codes of conduct) and the Vedanta, which represent the two opposite poles of the Hindu mind—the practical and the speculative,—were respectively evolved from the prose and the poetry of the Vedas.

THE SHASTRAS.

The teaching of the Shastras is, that laws were not made by any legislator, human or divine, but are self-existent, and as such are eternal and immutable; and that therefore man's duty consists in unquestioning submission to them. A virtuous life means nothing more nor less than a life consecrated to the performance of one's social duties. The dividing line between law and morals was not clearly drawn, and one ran into the other. Our people's social consciousness was broken in to this doctrine, and in the result, the willingness to subordinate one's individual self to the social self has become almost instinctive with us.

The Vedanta philosophy is the complete antithesis of this doctrine. It deliberately and completely turned its back on the social life of man, and set itself to solve the problem of the individual soul. "I and my Father are one," sums up the central doctrine of the Vedanta. According to this philosophy, man's salvation depends neither on work nor on faith; it

lies in the realisation of the truth that the human soul is one with the divine. He who realises the God in him is the only free man, and as such is above all social rules. The paradox that man is socially bound but spiritually free, dominated the classical mind of India; and the tragedy of Indian history consists in this utter divorce of life from thought.

This Vedic literature was a sealed book to the masses, the real people of India, and was open only to the ruling race, the Aryan conquerors, of whose genius it was the product. What really formed, or transformed, the psychology of the people at large, was the story of the lives of the Aryans of the heroic age, recorded in the two great epics of India, the Ramayana and the Mahabharata. These are tales of heroic deeds and noble endeavours, and the outstanding feature of the epic characters is their moral grandeur. These two epics also happen to be the unfailing source of all subsequent Sanskrit literature. Generation after generation of poets, dramatists, and story-tellers have drawn both their inspiration and their material from them. It is not necessary for me to dwell at length on later Sanskrit literature, because, in spite of all its high excellence, it has had little or no influence on either the form or the spirit of our modern literature. It could not influence life, because it was too far removed from life. We admire

it, but do not imitate it. It is urbane but conventional, elegant but stiff; it has form but no movement, it has colour but no warmth; in a word, it is as refined as it is bloodless. It seems that the spirit of the Shastras—the legal spirit—had taken possession of its soul, and crushed out its vitality. The latter-day products of Sanskrit literature show that the spirit of India stood in urgent need of thorough renovation.

II.

The invasion of the Mohammedans, which took place in the eleventh century A.D., gave the death-blow to the classical civilisation of India, and along with it to the decaying Sanskrit literature. Two hundred years did not pass before India saw the birth of a new literature—the vernacular literature. As its language shows, this literature was popular in its origin, and had, whether in spirit or form, little or no connection with the classical. The so-called Prakrit, or popular literature of the previous age was, however, even more artificial than the Sanskrit, and had nothing popular whatever about it. The new literature came out of a new religious movement, in which another side of the soul of our people is revealed—the emotional. During the course of ages Brahminic institutions had become so rigid and Brahminic thought so abstract, that they had practically ceased

to be human. On the other hand, the mind of the people had become intensely humanised by the influence of Buddhism, whose great teaching of infinite compassion for all sentiment creatures had sunk deep into the soul of the nation.

The simple doctrine of the fatherhood of God and the brotherhood of man, which the Mohammedans introduced into India, appears to have stirred the soul of the people to its depths, for we find that in the fourteenth century, in almost every part of India, religious reformers rose in protest against the empty formalism and the dry intellectualism of Brahminic orthodoxy. In this age. Vaishnavism, the oldest monotheistic creed of India, was revived throughout the length and breadth of the country. Neo-Vaishnavism, with its doctrines of a personal God, incarnation, divine grace, and salvation by faith, bears a close and striking resemblance to Christianity. As a romantic spiritual movement which set a new and supreme value on human emotions, it caused a simultaneous deepening and heightening of the emotional nature of our people. And the poets of this age poured out their emotions, social and religious, in language which is as simple as it is fervent.

III.

With the British conquest of India, there opens a new chapter of our psychology. In English literature our people discovered a new mental hemisphere, a new world of knowledge—the knowledge of the facts of this world,—and a dormant faculty of our soul awoke into life. What the German philosophers call the "will to know," suddenly manifested itself amongst our people in all its freshness and vigour. The Indian mind showed no hostility—not even the faintest—towards the message of science; on the contrary, our fathers displayed an extraordinary eagerness to acquire and spread the new learning which came from the West. The opening years of the nineteenth century thus saw the birth of a new literature, largely and deeply influenced by Western thought and Western feeling. The first half of the last century did not produce any permanent literature, because it was an experimental age—an age of text-books and translations. If we take the example of Bengal, we find that her period of literary apprenticeship came to an end with the close of the first century of British rule. The birth of this literature, which is at once modern and national, was synchronous with the assumption of the government of India by the Crown.

Our new literature is the expression of our new psychology, into the composition of which elements both European and Indian equally enter. I know of no process by which these can be separated, because

the human mind is not a chemical compound which admits of either quantitative or qualitative analysis. But we shall not go very far astray if we say that, what is modern in our literature has its root in modern Europe, and what is national in ancient India. Spiritually we all hark back to the Vedanta Philosophy, because Europe has not succeeded in robbing us of our sense of the Beyond. We welcome the science of modern Europe, but not its philosophy. We would sooner believe that all is spirit, than that all is matter. But we seek to modernise the ancient thought—that is to say, we would apply the doctrines of man's spiritual freedom to his social life. Europe has simply taught us to bridge the ancient gulf between Indian thought and Indian life.

Rabindranath Tagore incarnates in himself the whole spirit of the age, and in his works Europe can find all the heights and depths of our new psychology. But whilst European readers of his writings can easily recognise what is Western in thought and feeling therein; they fail to realise that his religious consciousness is inspired by the Vedanta, and that his lyrics are informed by the spirit of Vaishnava poetry. Our new literature at its best shows that in it the East and West have not only met, but have interpenetrated each other.

Manchester Guardian, March 28, 1918.